মসনদের দিন

শিশির গুহ

ত্রয়ী ঌ সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
(দ্বিতল) কলিকাতা—৯

[] প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৫৯ ॥

[] শ্রীমতী দেবযানী ঘোষ কর্তৃক বি ১/৯৫ কল্যাণী,
নদীয়া হইতে প্রকাশিত ॥

[] শ্রীমৃণালকান্তি রায় কর্তৃক রাজলক্ষ্মী প্রেস, ৩৮ সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ॥

॥ মা-বাবার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে ॥

লক্ষৌতি

গৌড় সাম্রাজ্যের রাজধানী। শাহানসা নবাব আলীমর্দ্দান গৌড়ের তখ্‌ত্‌-এ বসবেন তারই প্রস্তুতি চলছে। লক্ষৌতি সেজেছে নুতন সাজে। নানা জায়গা থেকে মেহমান আসবেন, আসবেন আমীর ওমরাহবৃন্দ। তাই রংবেরং আলোর রোশনাইতে ঝলমল করছে শাহানসার প্রাসাদ।

নামী-দামী উপঢৌকন নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে সবাই পরিচিত হবার লোভে ভিড় করেছে এখানে। জাঁকজমক পোষাকে ঝলমল করছে তাবৎ দরবার! প্রাসাদের বাইরে সুসজ্জিত অশ্বারোহী আর পদাতিক সিপাহীর দল শাহানসাকে কুর্নিশ জানানোর অপেক্ষায় প্রতীক্ষারত। প্রতীক্ষায় নানা বৈচিত্র্যের পোষাকে সুসজ্জিতা বাঁদীদের অন্দর মহল।

দরবারে আসার আগেই নকীবের কণ্ঠস্বর শাহানসার উপস্থিতির খবর জানিয়ে দিতেই সচকিত হয়ে উঠলো সবাই। প্রাসাদের বাইরে গর্জ্জে উঠলো কামানের গোলা। আকাশ-বাতাস মথিত করে কেঁপে উঠলো গৌড়জনপদ। নবাব আলীমর্দ্দানের মুখে-চোখে গভীর প্রশান্তি। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তার ফল ফলেছে এতদিনে। সোনার বাংলা আজ তার হাতের মুঠোয়।

দরবার শেষ হতেই বিস্তারিত খবরাখবর নিচ্ছিলেন শাহানসা তার বিশ্বস্ত অনুচর মুবারকের কাছ থেকে। মুবারক নিজে তদারকী করে সাজিয়েছে এই প্রাসাদ আর তামাম রাজ্য। শাহানসাকে খুশী করে ফয়দা আদায় করার সুযোগ সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়। নবাবের মনোরঞ্জনের জন্য এক বিরাট মহাফলের আয়োজন করেছে সে। এখানেই মুলাকাৎ হবে তাবৎ মেহমানদের সাথে। বাইজীদের গান-বাজনার তালে তালে খুপসুরত জেনানাদের

উপস্থিতি শাহানসার মেজাজকে বিলকুল শরীফ করে তুলেছিল। হঠাৎ প্রাসাদের বাইরে ভীষণ সোরগোলে শাহানসা উৎকণ্ঠিত হলেন। সাথে সাথে বাইরে ছুটে এল সিপাহী-শান্ত্রীর দল, সঙ্গে মুবারক স্বয়ং।

প্রাসাদের বাইরে বিক্ষোভ চলছে। বিদেশী এই নবাবের বিরুদ্ধে চলছে ধিক্কার। গৌড়ের সাধারণ প্রজারা এই নবাবকে চায় না। মানতে চায় না তার হুকুমনামা তার শাসন। সোনার বাংলায় অত্যাচারী শাসকের পদার্পণে অসংখ্য মানুষ আজ মরীয়া। শাহানসা মুহূর্ত্ত মাত্র কি ভাবলেন তারপর গোঁফের রেখায় ইষৎ হাসির রেখা ফুটিয়ে আদেশ করলেন প্রহরীদের—যাও, এদের বেঁধে চাবুকে চাবুকে দেহের চামড়া খসিয়ে নিয়ে নিমক লাগিয়ে দাও, দেশবাসীকে জানিয়ে দাও এরা নবাবের কাজে বাধা দিয়েছিল তাই এদের এই যোগ্য পুরস্কার।

পক্ষকাল চলেছে মুবারকের হত্যালীলা। নরনারীর ছিন্ন শির লুটিয়েছে পথের ধুলায়। বাহবা জানিয়েছেন নবাব আলীমর্দ্দান তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর মীর মুবারককে।

ধূর্ত্ত কৌশলী মুবারক বুঝেছিল ভাগ্য ফেরাতে হলে আলীমর্দ্দানের সুনজরে আসতে তাকে হবেই, কারণ ইকতিয়ার বখতিয়ার খলজীর সৈন্যরূপে আবির্ভূত হয়ে আলীমর্দ্দান যদি গৌড়ের নবাব হতে পারে তবে সেই বা কমতি কিসে! তাই একটা দুশমনের মাথা চাইলে মুবারক দু'টো মাথা হাজির করতো নবাবের কাছে। এই মুবারককে দিয়েই তিনি সমগ্র গৌড়ে সন্ত্রাসের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন, হত্যা করেছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়দের, স্বজাতিদের। খুনের নেশা তখন সম্রাটের মাথায়, তাই নিষ্ঠুরতাকে অবলম্বন করেই করায়ত্ব করতে চাইলেন তামাম গৌড় রাজ্য! গুপ্তচর খবর আনলো প্রজারা নবাবকে বলছে-নরকের কীট, পিশাচ, আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন নবাব আলীমর্দ্দান। মুবারক সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনছে। সম্রাটের হুকুম তামিল করেই একদিন তাকে নবাব হতে হবে, কোন বংশ মর্য্যাদাতো নেই তার, শুধু বলবুদ্ধি চাতুর্য্যই

তার একমাত্র পরিচয়, অতীত তার কাছে অন্ধকার; ঘোর বিভীষিকা।

বিমাতার অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বহীন পিতার ওপর ক্রোধে ক্ষুব্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করেছিল সে, তারপর দীর্ঘদিন দিল্লীর পথে পথে রাজপুরুষদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অবশেষে দস্যু তস্করদের গোপন আড্ডায় দীক্ষা নিয়ে খুন জখমের তালিম নিয়েছিল কিছুদিন। বয়স বাড়বার সাথে সাথে ডাকাত হবার বাসনা ছেড়ে সিপাহীর কাজের অনুসন্ধানে অনেক ঘুরেছে মুবারক, শুনেছে বাংলার সৌভাগ্যের কথা, এদেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে এলেও নাকি বড়লোক হওয়া যায়, মুবারক সুযোগ খুঁজেছে বাংলাদেশে আসার।

বাংলাদেশ তখন ব্যবসায়ীদের কাছে বেহেস্ত-এর ফুলবাগ। যে কোন কঠিন কাজ করিয়ে নিতে হলে তখন নবাবের নজরানা ছিল খুপসুরৎ জেনানা। এমনি এক নারী ব্যবসায়ীর পিছু ধরে বাংলা-দেশে এসেছিল মুবারক আর তারই চেষ্টায় সিপাহীর চাকরী পেয়েছিল সম্রাটের ফৌজে। তারপর ধীরে ধীরে কৌশলে সম্রাটের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছে সে, নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করেছে শাহানসার কাছে। সিপাহী থেকে সিপাহসালার, সম্রাটের স্বপ্ন দেখতেই বা আটকায় কে! নবাব আলীমর্দ্দানকে খুশী করতে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে, সর্ব্বক্ষণ ছায়ার মত হুকুমের প্রতীক্ষায় রয়েছে সে, আর তারই ফলশ্রুতি মিলেছে দীর্ঘকাল পর। ভাগ্যের যশোলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন মুখে তাকিয়েছে মুবারকের দিকে। মিলেছে পদ, নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কিছু জায়গীর আর নিরীহ প্রজাদের ওপর খবরদারী করার ফরমান।

নবাব আলীমর্দ্দানের স্নেহভাজন মীর জুমলা মুবারক হুসেন অল্প দিনের মধ্যেই অনেক কণ্টক বিজড়িত সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে এখন ক্ষমতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এই ক্ষুদ্র জায়গীর থেকে তামাম হিন্দুস্থানের সম্রাট হবার বাসনায় আলীমর্দ্দানের মত অত্যাচার চালিয়ে নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত তিনি। তাঁর এলাকায়

তিনি শাহানসা, প্রজাদের কাছে তার পরিচয় তিনি সম্রাট, তিনি পীর পয়গম্বর স্বরূপ। অকৃতজ্ঞ নয় মুবারক। অতীতকে সে ভোলেনি, তাই সেই নারী ব্যবসায়ী আজো সৌন্দর্য্যের হুরী, খুপসুরৎওয়ালী জেনানাদের ভেট দিয়ে তার কাছ থেকে আশরফি কুড়িয়ে নেয় মুঠো মুঠো। মুবারক জানে এই বৃদ্ধই তাকে একদিন বাংলার পথ চিনিয়েছিল তাই আশাতিরিক্ত ইনাম দেয় বৃদ্ধকে আর নারী ব্যবসায়ী ইমাম-ই-হুদা প্রাণভরে আল্লাহতালার কাছে ওর হয়ে সালাম জানিয়েছে আর মনে মনে বলেছে—সাবাস্ বেটা, এ জিন্দগী তো মরদকে হ্যায়—ডরপোককে লিয়ে নেহি।

মুবারক নিজের দরবার সাজিয়েছিল সম্রাটের প্রাসাদের অনুকরণে, ঠাঁই দিতে চেয়েছিল ইমাম-ই-হুদাকে কিন্তু রাজী হয়নি সুচতুর ব্যবসায়ী, সে জানতো বাংলাদেশের যশোলক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা, পদ্মপাত্রে পানির মত সম্রাটদের খ্যাতি, ইমাম বলতো—সাব্বাস শাহানসা, আপকো দিল হ্যাঁয় লেকিন হুজুর কসুর মাৎ লিজিয়ে, আপতো জানতেহি হ্যাঁয় কি ম্যয়নে সওদাগর হুঁ, টহল করতে হুয়ে হামারা দিন গুজরানা হ্যায় জনাব।

কুর্নিশ জানিয়ে নবাবের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করেছে মিষ্টভাষী ব্যবসায়ী কিন্তু চটায়নি তাকে। সে জানে হিংস্র শার্দ্দুলকে যতদিন মাংসের জোগান দেয়া যায় ততদিন সে হাতের মুঠোয়।

হেসেছে শাহানসা মুবারক, প্রখর দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পক্ক কেশ-মণ্ডিত গোঁফদাড়ির মধ্যে অত্যন্ত সুচতুর চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছে, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। মুবারক নিজেও যে স্নেহ নীড়ে বড় হয়েছিল সে এমনি এক বৃদ্ধ। নির্বান্ধব চাচাজী তাকে সমস্ত বিপদের মাঝেও তার স্নেহপক্ষপুটে সযত্নে লালন করেছিল। তারপর একদিন সব শেষ। চাচার পতনের পর চাচীর মৃত্যু, বিমাতার উত্থান। বিচিত্র এই পৃথিবীটা, যার যখন দাপট, সংসার জগত যেন তখন তারই বশ। একটা ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর ঈর্ষার অজাগর মনের মধ্যে গজরাতে থাকে মুবারকের। না না, জীবনে কাউকে

করুণা নয়, দয়া নয়, শুধু নিষ্ঠুরতা, শুধু খুন, তাজা খুন। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায় নবাবের। কেউ নেই সম্মুখে, কখন যে সেলাম জানিয়ে ব্যবসায়ী বিদায় নিয়েছে তা খেয়ালই নেই তাঁর।

বিশ্রাম কক্ষে পায়চারী করছিলেন নবাব, হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে একটা ছায়া দেখে ডাক দিলেন—কৌন হ্যায় ?

—জী জনাব। কুর্নিশ জানাল বাঁদী, বেগম গুলাবী সেলাম জানিয়েছেন হুজুর।

বেগম গুলাবী! একটু ভাবিত হলেন শাহানসা, তারপর বল্লেন, আচ্ছা যাও। বেগম গুলাবী হারেমের সবচেয়ে সুন্দরী, সৌন্দর্য্যের রাণী, লোকে বলে, বেহেস্তের হুরী, আর দুশমনরা বলে, মুবারক আল্লাহতালার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে লাভ করেছেন।

বড় ভাল লাগে শাহানসার এই নারীকে। নারী তার কাছে শুধু ভোগের সামগ্রী মাত্র কিন্তু গুলাবী যেন অন্য কিছু—আরো কিছু। দুশমনদের ঈর্ষা তাকে খুশী করে, অধিক মজবুর করে তোলে।

বেগম গুলাবী—

দিল্লীর বাদশাহের ফরমান নিয়ে নিজেদের গদী পাকাপোক্ত করবার সময় ওমরাহরা গৌড় নবাবকে অনেকগুলো খুপসুরুৎ জেনানা ভেট দিয়েছিল। গুলাবী বিবি সে স্তবকেরই একটি ফুল। সুদীর্ঘকাল সম্রাটের ছায়ার মত পাশাপাশি নিঃশব্দে হুকুম তামিল করেছে মুবারক হুসেন, সিপাহী থেকে হয়েছে পার্শ্বচর, আত্মীয়-অনাত্মীয় মায়া মমতা সমস্ত কিছু নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে সম্রাটের পায়ে পায়ে জড়িয়ে রয়েছে অনেক কাল। অত্যাচারী সম্রাট আলীমর্দ্দানের চোখের ইংগিতে কত বিদ্রোহী আমীর-ওমরাহের কাঁধ থেকে নাবিয়ে দিয়েছে তাদের শির, তাজা লাল খুনের নিশান দেখিয়ে খুশী করেছে নবাবকে। তাই মুবারক সম্রাট আলীমর্দ্দানের শুধু পার্শ্বচরই নয়, সে নবাবের সাথী, বন্ধু, গোলাম সব কিছু।

সম্রাট আলীমর্দ্দান তার সেবায় খুশী হয়ে বলেছিল—মুবারক কি চাও তুমি ? ক্যায়া মাংতা ?

বিনয়ে কুর্নিশ জানিয়ে আবেদন পেশ করেছিল ধূর্ত মুবারক।

—হুজুর, অগর গোলাম কো কুছ দেনা হ্যায় তো আপকো বাগসে মুঝে এক ফুল চাহিয়ে শাহানসা।

ধূর্ত সম্রাট মনুষ্য চরিত্রের সব দিকগুলো সম্পর্কে সজাগ, তাই এ ইংগিত বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরী হয়নি তার, শুধু বলেছে—যাও মুবারক তুমহারা আরজি মঞ্জুর। নবাবের সেই প্রতিশ্রুতির ফসল গুলাবী বাঈ। সম্ভবত গুলাবীর রূপ-লাবণ্যের সঠিক খোঁজ তখনও পাননি নবাব তাই অত সহজে গুলাবীকে দিয়ে দিয়েছিলেন মুবারকের গ্রাসে।

মীর মুবারক অতীতের স্মৃতিপথে পদচারণা করেন। প্রথম অভিসার রাত্রিতে গুলাবী বলেছিল…

—জাঁহাপনা, আপনি আমার প্রভু, আমার আল্লাহতালা, আমি আপনার খিদমত পেশের বাঁদী, কিন্তু শাহানসা এই বাঁদীর একটা আর্জি আপনার কাছে, যদি অভয় দিন তো পেশ করি! আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষারত পতঙ্গ তখন অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে বলেছে—বল পিয়ারী কি তোমার আর্জি?

শাহানসা, আমি যেন সারাজীবন আপনার আনন্দের অংশীদার হতে পারি, আপনার জীবনে আমি যেন ছায়ার মত আপনার সুখে দুখে সেবা করতে পারি, শুধু একটা অনুরোধ জাঁহাপনা আপনি আমাকে শুধু ভোগের সামগ্রী ভাববেন না, আমাকে বেগমের মর্য্যাদা দেবেন, আপনার ব্যথা-বেদনার অংশীদার করবেন।

কথা শুনে মনেমনে খুব হেসেছিলেন সম্রাট, ভেবেছিলেন নারী লালসার মধুভাণ্ড। বলেছিলেন…আমার হারেম যদি তোমার ভাল লাগে তবে তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না গুলাবী বাঈ। আনন্দে আবেগে নিজেকে সমর্পণ করেছিল গুলাবী মুবারকের কাছে। হিংস্র ব্যাঘ্রের বুকে ঝাঁপ দিতে ক্ষুদ্র মেষের একটুও ভয় হয়নি সেদিন।

চতুর নবাব মুবারকের মনে একটা জিজ্ঞাসা বার বার দোলা দিয়েছে—জানতে ইচ্ছে হয়েছে গুলাবীর অতীতের ফেলে আসা দিন—অতীত ইতিহাস।

কিসের ওর এত স্পর্ধা যে মুবারকের হারেমে আসবার সাথে সাথেই বেগম হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, বাঁদীর বেগম হবার সাধ কেন! কে দিল তাকে এত স্পর্ধা। ভাবিত হয়েছেন মুবারক পরক্ষণেই মনে হয়েছে নারীর হৃদয় ফুটন্ত ফুল বাগান, গুলাবী সে বাগানের একটি সতেজ বসরাই গোলাপ বই তো নয়। যৌবন ঝরে গেলেই পাপড়ি খসে পড়বে, যাকনা সে কটা দিন।

মুবারক আর পাঁচ-সাতটা নারীর মত ভেবেই গুলাবীকে বলেছিলেন—ঠিক আছে, তুমিই আমার বেগম মহলের প্রধানা। কিন্তু সেদিন কি বুঝেছিলেন যে নারীর কামনা-বাসনার ছলনার কাছে তিনি অতি দ্রুত পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ছেন।

মুবারক চিন্তার জাল ছিঁড়ে ধীর পদে হারেমের দিকে এগোলেন। দুপাশে খোজা-বান্দার দল কুর্নিশ জানাল নবাবকে, মুবারক গুলাবী বাঈ-এর মহলে ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল মহলের দরওয়াজা।

ঘরে ঢুকেই অবাক হলেন মুবারক, সারা ঘরময় ফুলের বাহার। থোকা থোকা বিচিত্র রংয়ের গোলাপ, যেন ফুলের সাম্রাজ্য এখানে। কুর্নিশ জানিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতেই খুব ভাল করে গোলাবী বাঈ-এর দিকে তাকালেন তিনি। নিখুঁত অপূর্ব সুন্দরী, মনে মনে সুপ্রসন্ন হন মুবারক, সত্যি এতরূপ দিয়ে খোদা বুঝি আর কোন নারীকে গড়েননি। আবেশে আদর করে গোলাবী বাঈকে কাছে টেনে বল্লেন—বিবি সমস্ত গোলাপকে তুমি লজ্জা দিয়েছ, তোমার মত গোলাপ থাকতে এ ঘরে কি আর ওদের ভাল লাগে। চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে শুধালেন, কি ব্যাপার আজকে। তোমার মহলে আজ এত সাজ এত জৌলুস আগে তো কিছু বলনি! অধরে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে গোলাবী বাঈ বলেছে—জাঁহাপনা, সারাদিন তো সাম্রাজ্যের কাজে, কঠিন চিন্তায় শত্রুমিত্রদের নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হয়, হয়ত বা ক্লান্তও হয়ে যান, তাই মনে হোল যদি মাঝে মাঝে আপনাকে কাছে পাই, দুদণ্ড আপনার সেবা করে

আপনাকে একটু শান্তি দিতে পারি, সেজন্যেই আপনাকে বিরক্ত করেছি জাঁহাপনা, আপনি কি ক্ষুব্ধ হয়েছেন ?

হতবাক হয়েছেন মুবারক, কি মমতাময়ী নারী, খুশীতে নেচে উঠেছে তাঁর মন, আনন্দে গোলাবীর হাত ধরে বলেছেন—না, ক্ষুব্ধ হইনি বেগম, খুশী হয়েছি, তোমার মত বেগম যার ঘরে সে কি খুশী না হয়ে পারে। তোমার এই নিজস্ব মহলে আমাকে ডেকো, যখন ইচ্ছে, যখন তোমার প্রাণ চায়, আমি নিশ্চয়ই আসবো বেগম।

কুর্নিশ জানিয়েছে গোলাবী, বাধা দিয়েছে মুবারক, না-না কুর্নিশ নয়, সেলাম নয়, তুমি আমাকে ভালবাসো, আমাকে তৃপ্ত কর, আমার তৃষিত বক্ষে তোমার শান্ত রূপের স্নিগ্ধ মমতা-বারি সিঞ্চন কর নারী, আবেগে আকুল হয়ে মীরজুমলা মুবারক জড়িয়ে ধরেছেন তার হারেমের সবচেয়ে সুন্দরী গোলাবী বাঈকে তার প্রিয়তমা বেগমকে।

গোলাবী বিবির মহলে নবাবজাদার আগমন মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো মহলের বিভিন্ন প্রান্তে, উচ্চকিত হল সব্বাই, বিভিন্ন চিন্তা, ফিসফিসানী শুরু হল মহলে মহলে। শুধু একটি নারী তখন অতি সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে আল্লাহতালার কাছে মিনতি জানিয়ে বলেছে, খোদা আমার স্বামীকে রক্ষা কর, অন্যায় পাপ, অত্যাচার থেকে তাকে নিবৃত্ত কর, তাকে প্রজার কল্যাণ করার সুমতি দাও খোদা।

সারা ঘরে যেন পবিত্রতায় ধূপ জ্বলছে, শুচিশুভ্র রমণী বেগম মহলের রাজকীয় অনাচার ব্যভিচারের মাঝে থেকেও নিজের ঘরকে যেন বেহেস্ত বানিয়ে রেখেছে, বেদনায় ব্যথায় জ্বলে-পুড়ে নিজেকে করেছে পবিত্র পাবক শিখার মত, খোদার কাছে প্রতি সন্ধ্যায় নামাজের সময় আরজি জানিয়েছে স্বামীর কল্যাণের, বলেছে আল্লাহতালা, দীন দুনিয়ার মালিক, তুমি পতঙ্গকে পতঙ্গই থাকতে দাও, ওকে পাখী হবার স্বপ্ন দেখিয়োনা আল্লা।

চোখের পানি দেখে বাঁদীর চোখেও কান্না নেমেছে, অশ্রু

বিগলিত কণ্ঠে বলেছে—বেগম সাহেবা কি তোমার দুঃখ, কি ভাবো সব সময়, আমাদের নবাবজাদা তো খোদার হুকুমেতেই সব কাজ করছেন, কেন তুমি তার অমঙ্গলের কথা ভাবছো।

—না, না, তুই আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিসনে বাঁদী, আমিতো শুধু মাত্র তার সুখের সময়ে থাকতে আসিনি, আমি যে তার দুখের সাথীরে, আমাকে কাঁদতে দে, আমার চোখের পানিতে যদি তার সমস্ত গুনাহ্ মাপ হয়ে যায় তবেই আমার সান্ত্বনা। অশ্রুসজল কণ্ঠে ডুকরে কেঁদে ওঠে বেগম মরীয়ম। সে যেন স্পষ্ট স্বামীর ভবিষ্যত দেখতে পায়, যেন গোটা মুল্লুকে ঝড়ের সংকেত, বিপদের অশুভ হুঁশিয়ারী দেখতে পেয়ে আশঙ্কিত:হয় নারী, বলে—বাঁদী জাঁহাপনাকে একবার আমার মহলে আসতে বলিস তো, বলবি খুব জরুরী খবর আছে।

অবাক হয় বাঁদী, সত্যি হারেমের বেগম, জারিয়া প্রত্যেকটি যেন বিভিন্ন চেহারার হলেও তাদের মধ্যে শুধু লোভ-লালসার লিপ্সা, শুধু পাবার আকাঙ্ক্ষা, শুধু নিজ স্বার্থের পশরা বোঝাই করার তালে ব্যস্ত সব্বাই। কিন্তু বেগম মরিয়ম যেন আলাদা জগতের নারী, আলাদা সমাজের ভিন্ন স্বাতন্ত্র্যের রমণী। শ্রদ্ধায় বাঁদীর মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে মরিয়ম বেগমের উদ্দেশ্যে, মনে মনে বলে—খোদা মরিয়ম বেগমের দুঃখ দূর করে দাও, তাঁর চোখের পানি মুছিয়ে দাও আল্লা।

জোর গুঞ্জন উঠেছে বেগম মহলের আনাচে কানাচে, বাঁদীরা সক্রিয়, যেখানে যা খবর তাকে রং মাখিয়ে রস লাগিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে বেগমদের কাছে। ক্ষণে ক্ষণে জারিয়ারা একত্রিত হচ্ছে সলা পরামর্শ হচ্ছে গোলাবীর বিরুদ্ধে। নিশ্চয় যাদু কিংবা তুকতাক করেছে জাঁহাপনাকে, তা-না হলে ডাক পাঠাতে না পাঠাতে হুজুর হাজির। যে না রূপ, তার আবার অহংকার, কোথাকার না কোথাকার বাঁদী তার আবার বেগম হবার খোয়াব, গোলাবীকে নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে চাটনী খাবার মত আলোচনা চলে বেগম মহলে, গোলাবী এর বিন্দু

বিসর্গও জানতে পারে না। গোলাবীর রূপ লালিত্য আধিপত্যে ঈর্ষার আগুন জ্বলতে থাকে বেগম সমাজে।

বিগত যৌবনা পেশোয়ারী নারী আশমানতারার বুকটা জ্বালা করে ওঠে। প্রতিশোধের চরম ইচ্ছা মনের মধ্যে গুমরে ওঠে। আজন্ম শঠতা, প্রবঞ্চনা দেখে দেখে আশমানতারার মনেও একটা দুষ্ট বুদ্ধি মাথা চাড়া দেয়, রাতের গভীর অন্ধকারে নিজের বাঁদীকে পাঠিয়ে দেয় সিপাহী সর্দ্দার অমীর গওহর খানের কাছে। জরুরী খবর, যে করে হোক দেখা হওয়া চাই আশমানতারার সাথে, ভাগ্য ফেরাবার গোপন খবর তার গোপন মনের নিভৃত আখড়ায় অপেক্ষা করছে।

বাঁদী যেতেই নিজের মহলে উত্তেজিতভাবে পায়চারী করতে থাকে আশমানতারা, আমীর গওহরকে তার প্রয়োজন। উদ্ধত বলিষ্ঠচেতা এই যুবাই একার্য্য উদ্ধারে সক্ষম, গওহরের যৌবন আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে তাকে তার চাই, উৎকণ্ঠায় বাঁদীর অপেক্ষায় খিড়কী পথে তাকিয়ে রইলো আশমানতারা। অলক্ষ্যে ওর মনে ভিড় করলো ফেলে আসা অতীত।

আশমানতারা তখন সবে কৈশোর পেরিয়ে যৌবন ছুঁই ছুঁই করছে, বয়স তেরোর কোঠায়, একদিন পানির সন্ধানে বেরিয়েছিল আশমানতারা, ঘরে অসুস্থ আম্মাজান, বাবা বিদেশে। চারদিকে মড়ক, মৃত্যু আর, মৃত্যু, অনাবৃষ্টি আর প্রখর রৌদ্রে সবুজের চিহ্ন নেই, ধূ-ধূ প্রান্তর, শুধু লু বইছে চারিদিকে, বাতাস শরীরের চামড়া ভেদ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। ঘরে এক ফোটা পানি নেই, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভুল বকছে আম্মাজান, একটু পানির জন্য। খোদার কাছে কত মিনতি করেছে কিশোরী আশমানতারা কিন্তু সে মিনতি কি খোদা শুনেছে! শোনেনি, খোদা সমগ্র জীবনতাকে চরম দুঃখ দিয়েছে, তার নারী জন্ম ব্যর্থ করে দিয়েছে, তাকে বন্ধ্যা করেছে, তাই আশমানতারা সমগ্র জীবনে অগুন্তি পুরুষকে সংগ দিয়েছে, তৃপ্তি দিয়েছে, পেয়েছে শুধু জ্বালা আর চিরসাথী হয়েছে তার দীর্ঘশ্বাস। সেই চরম দুর্দ্দিনে আশমানতারার মুখ বেঁধে জোর করে

কোথাকার একদল ঘোড়সোয়ার নিয়ে এল সুদূর পারস্য থেকে। কোথায় কোন অজানা দেশে। তিনদিন সংজ্ঞাহীন আশমানতারা মুখে দানা কাটতে পারেনি। সর্ব্বাঙ্গে ফোড়ার ব্যথা, অকথ্য অত্যাচারে বিবশ দেহ, ক্ষুধা পিপাসায় কণ্ঠে স্বর নেই। তিন দিন পর চোখ মেললো আশমানতারা, কাছে আধ-বয়েসী মহিলা। ইসারায় পানির মিনতি করতেই মহিলা নিয়ে এল ভর্ত্তি একগ্লাস পানীয় আঙ্গুরের রস। আঃ কি তৃপ্তি, আরো চাই, আরো আরো। জীবনে প্রথম এত ভালো আঙ্গুর আর সরবৎ খেলো আশমানতারা। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কি যেন শুধালেন মহিলা, কিন্তু আশমান-তারার কানে পৌঁছল না সে শব্দ। মাথায় হাত বোলানোর সাথে সাথে ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল আপনা হতেই।

আশমানতারার পুরো তিন বৎসর কাটলো এখানে। আমীর সওদাগর জুমা খাঁর প্রমোদ উদ্যানে। আশমানতারা সওদাগরের ভোগের সামগ্রী, দীর্ঘকাল তিনি এসব সওদাকে নিজের উদ্যানে রাখেন না, নূতনের আকর্ষণে পুরোনোকে তিনি চালান করে দেন অন্যত্র। এই প্রথম তিন বৎসর আশমানতারা দুনিয়াকে দেখেছে অদ্ভুতভাবে, জেনেছে নারী শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী মাত্র, তাদের সুখ দুঃখ থাকতে নেই, সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই, তারা পুরুষের পয়জারের সামিল। সওদাগর আশমানতারাকে আবার চালান করেছে সুদূর দিল্লীতে, অনেক সিপাহী, আমীর, উজিরের আনন্দের জোগান দিতে দিতে জীবনের বেশ কিছু বছর পেরিয়ে গেছে নিঃশব্দে। দেহের ভাঁজে ভাঁজে এসেছে বয়সের চিহ্ন, কমেছে নারী দেহের সুষমা, লালিত্য।

জীবনে ভালবাসা পায়নি আশমানতারা কিন্তু ভালবেসেছিল একজনকে সর্ব্বস্ব দিয়ে হৃদয় দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে।

কিন্তু তার সে সুখ সইলো না, খোদা তাকে পরপারে ডেকে নিলেন; আবার অনাথা হোল আশমানতারা। উত্তাল তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে সামান্য কূটোর আশ্রয় মিললো না কোথাও, এই

অবস্থায় সমাজের সবচেয়ে নোংরা জায়গা থেকে উদ্ধার করলো সিপাহী আলী গওহরখান, ভেট দিল নবাব আলীমর্দ্দানের প্রিয়ভাজন আমীর মীর মুবারকের কাছে, সুচতুর সিপাহী গওহর উন্নীত হোল সর্দ্দার পদে। তারপর মিললো রিসালদারী।

এই সেই সর্দ্দার আলী গওহর খান।

দ্বারে টোকা পড়তেই চিন্তার সূত্র ছিন্ন হোল আশমানতারার, তাহলে বাঁদী ফিরে এল! দরজা খুলতেই দেখা গেল সামনে দাঁড়িয়ে বাঁদী, হাসি হাসি মুখে বললো—বেগম ইনাম দাও—সুখবর আছে। এক হ্যাঁচ্‌কা টানে বাঁদীকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করলো আশমানতারা। ফিস ফিস করে শুধালো—

—দেখা হয়েছিল?

—জী বেগম সাহেবা।

—কি বললো সে?

—অনেকক্ষণ হাসলো হুজুরাণ, তারপর বললো, যাবো সময় করে।

—খুব জরুরী, বলিসনি?

—জী হ্যাঁ, তারপরই বললেন, কাল গোসলখানার খিড়কী দরওয়াজার পাশে তিন পহর রাতে থাকতে বলিস দেখা হবে।

একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরুল আশমানতারার। তারপর বাঁদীর দিকে তাকিয়ে বললো---যা কাজ উদ্ধার হোলে তোর উপযুক্ত বকশিশের কথা আমার ইয়াদ থাকবে।

মুজরো গানের আসর বসেছে।

আমির ওমরাহদের আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করেছেন আমির কুলপতি মুবারক।

গোলাব মঞ্জিলের চত্বরে গোলাব বাগে গানের মহফিল। অনেক নাম করা বাঈজীদের উপস্থিতি এখানে। গোলাবী বাঈ-এর আদরের এই বাগ, আজ গুলজার।

দ্বাররক্ষী এসে কুর্নিশ জানাল।

—শাহানসা।

দ্রুত পায়ে উঠে এলেন মুবারক, সম্রাটের কান বাঁচিয়ে নিজেকে শাহানসা জাঁহাপনা,নবাব বললে ভালই লাগে তাঁর, তাবলে অন্যান্য আমীর ওমরাহদের সামনে বললে পাঁচ কানের কথা যদি নবাব আলীমর্দ্দানের কানে পেঁৗছয় তবে!

নবাব আলীমর্দ্দানের এত্তেলা এসেছে। আগামী কালের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করে নবাবের কাছে হাজির হতে হবে, যুদ্ধের ডাক এসেছে।

কিঞ্চিৎ ভাবনায় পড়লেন মুবারক, সবে সরাবীর নেশাটা জমে আসছিল, বাঈজীদের নাচ এখনো শেষ হয়নি। নূপুরের কিঙ্কিনি এখনও শোনা যাচ্ছে, দোস্ত বেরাদররাই বা কি ভাবছে। নাঃ যত্ত সব বেরসিক—বেতমিজের দল!

মুবারক মহফিলে ঘোষণা করলেন নবাব আলীমর্দ্দানের ফরমান। দুশমনের সাথে পাল্লা দেবার ডাক এসেছে—এবারের মহফিল, যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুশমনের টাটকা খুনে।

থেমে গেল বাঈজীর গান—সংগতকারের বীণা, তবলচির তবলা, প্রচণ্ড বিরক্তিতে আয়েস ভেঙ্গে উঠে পড়লেন ওমরাহরা। অর্দ্ধ সমাপ্ত আকাঙ্ক্ষায় টলতে টলতে সরাবিতে শেষ চুমুক দিলেন অনেকে।

শাহ মুবারক ওমরাহদের ওপর হুকুম জারী করলেন। সামনে মহা বিপদ, দুশমনের ঘোড়ার খুরের শব্দ সাম্রাজ্যের প্রান্তে শোনা যাচ্ছে, সুতরাং সব্বাইকে কোমর বাঁধতে হবে—সব্বাইকে যেতে হবে গৌড় সম্রাটের কাছে—নবাবের হুকুম। নবাব আলীমর্দ্দানের নামে গোলাপী নেশা কাটলো অনেকের, ছুটলো সবাই নিজ নিজ এলাকায় কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ আমীর-ই-ইকবালই নীরবে বলিষ্ঠ ভংগীতে তখন একটা সতেজ বসরাই গোলাপের পাপড়ীতে নাক ডুবিয়ে আছে।

একে একে সমস্ত আমীর নিজ নিজ এলাকায় ছুটলেন কিন্তু

বসে রইলেন আমীর-ই-ইকবাল। একান্তে মুবারককে ডেকে বললেন—

—দোস্ত, তুমিতো নবাব শাহানসা বলে গোটা চত্বরে খেতাব কুড়িয়ে বেড়াচ্ছ কিন্তু নিজের এলাকায় দুশমন যে মাথা চাঙ্গা করে উঠেছে তার কি খবর রাখো ?

—ঝুটা বাৎ, আমাকে বাচ্চা শিশু পাওনি ইকবাল, এলাকার প্রতি ধূলি-কণা মাটির খবর পর্যন্ত মুবারকের কানকে ফাঁকি দিতে পারে না আর দুশমনতো দূরের কথা।

মুবারকের কণ্ঠে অবিশ্বাসের হাসি।

ইকবাল ধূর্ত চোখে মুবারকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল—

—সাব্বাস্ এই বুদ্ধি নিয়ে নবাবীর খোয়াব দেখছো খাঁ সাহেব, গোটা এলাকা জুড়ে জাল পাতা হয়েছে, এখন থেকে যদি হুঁশিয়ার না হও, তাহোলে একদিন সকাল বেলা দেখবে তোমার আমিরী নেই, উজীরী নেই—বিলকুল রাস্তার মুফলিশ হয়ে গেছ।

উত্তরের অপেক্ষা না করে উঠতে চাইল ইকবাল কিন্তু বাধা দিয়ে মুবারক বললো—কি ব্যাপার খোলসা করত ইকবাল। হো-হো করে হেসে ইকবাল বললো—আলীমর্দ্দানের দয়ায় যারা ঘোড়াঘাট দিনাজপুর অঞ্চলে উজীরি সর্দ্দারী পেয়েছিল তারাও আমিরীর খোয়াব দেখছে মুবারক—সুতরাং হুঁশিয়ার!

মুবারক দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে উত্তেজিতভাবে পায়চারী করতে করতে বললো—বেইমান বেতমিজ।

ঘুম আসছে না মুবারকের, শাহানসা, বাদশা, হুজুর শব্দগুলি কানের কাছে অহরহ ব্যঙ্গ করছে। বারবার মনশ্চক্ষে ঘোড়াঘাট দিনাজপুরের প্রান্তরগুলিতে মনকে ছুটিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন, কোথায় তার গুপ্ত শত্রু কিংবা কে সে দুঃসাহসী যে মুবারকের অস্ত্রকে ভয় করেনা। পরক্ষণেই মনে হোল এটা মিথ্যে এটা ভুল নেহাৎই গুজব মাত্র। ইকবাল হয়ত ভুল শুনেছে কিন্তু এ ভেবেও মনকে শান্ত করা গেল না।

পালঙ্ক থেকে উঠে দাঁড়ালেন মুবারক, বাইরে বেরিয়ে দেখলেন প্রহরীরা অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত। এ সময়ে হুজুরকে বেরুতে দেখে হকচকিয়ে গেল দ্বাররক্ষীরা, নবাব আনমনে হাঁটিতে হাঁটতে হারেমের দিকে এগোলেন। প্রায় সব ঘরের বাতি নিভেছে, শুধু একটি বাতি নিবু নিবু করে স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে গুলাবী বাঈ-এর ঘরে।

অদম্য কৌতূহল মুবারককে আলোর দিকে নিয়ে গেল। হারেমের খোজা বান্দারা হতভম্ব, সম্রাট শাহানসা এসময়ে এখানে!

ধীর পায়ে গুলাবীর ঘরে এগোতেই তিনি শুনলেন, কিসের সুর ভেসে আসছে যেন। মুবারক দ্বার প্রান্তে শব্দ করতেই গুলাবী দরজা খুলে কুর্নিশ করে সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই অবাক হলেন মুবারক, শুধালেন—

—তুমি কি আমার আগমনের কথা জানতে গুলাবী?

—না জঁাহাপনা।

—তবে পরম নির্ভয়ে দরওয়াজা খুলে এগিয়ে এলে কি করে?

—আমার মন বলছিল জঁাহাপনা আপনি আজকে আসবেন, আমি যে আপনার মনের খবর বুঝতে পারি জঁাহাপনা।

—এত রাত জেগে কি করছিলে তুমি? হারেমের সমস্ত আলো এখন নিষ্প্রভ, তোমার ঘুম আসছে না?

—জঁাহাপনা মেহেরবান, আমি তো বলেছি, আমার মন বলছিল, আপনি আসবেন, তাই আপনার প্রতীক্ষায় সময় গুণছিলাম। মুবারক গোলাপীর হাত দুটি ধরে সস্নেহে আদর করে বললেন—বেগম, খবর পেলাম আমার, জন্য তুমি খোদার কাছে আরজি কর। একথা কি সত্যি?

—জী জঁাহাপনা।

—কিন্তু তুমি জাননা বেগম কি অসহ্য যন্ত্রণায় আমি এখানে ছুটে এসেছি, একটা বিভীষিকা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই ভাবছিলাম কয়েক দিনের জন্য ঘোড়াঘাট ঘুরে আসবো।

—আমিও আপনার সাথে যাবো জঁাহাপনা।

—সেকি! ওটা মহফিলের জায়গা নয় বেগম, ওখানে অশ্রু আর খুনের মহব্বৎ। বেগমের প্রবেশ সেখানে বন্ধ।

—না, জঁাহাপনা, আমার জন্য আপনার কোন তকলিফ্ হবে না।

—জানি বেগম, একটা অজানা আশঙ্কায় তুমি আমাকে ছাড়তে চাইছো না। এ তোমার ভালবাসার কথা। কিন্তু রাজ্য চালনায় তামাম এলাকায় খুন-খারাপীর মেলা, তবু এই হৃদয়ের ক্ষুদ্র কোণে আমার বেগমের জন্য একটু জায়গা আছে। এ জায়গায় তুমি ছাড়া আর কেউ কোন দিন আসবে না গোলাবী।

অশ্রুসজল হয়ে ওঠে গোলাবীর চোখ, মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করে হঠাৎ ফুঁসে ওঠে কালনাগিণীর মতন। জঁাহাপনা, আমি বাঁদী, আমার মুখে এসব কথা হয়ত মানায় না, কিন্তু হুজুর বিশ্বাস করুন, আমার মন এখানে এক মুহূর্ত থাকতে চায় না, ইচ্ছে হয় চীৎকার করে কাঁদি, খোদা মেহেরবানের কাছে আরজি করি, এখানে বজ্রপাত হোক, তামাম বেইমান বিবিরা দোজকে যাক্ কিন্তু পারি না। খোদার কাছে কারো অমঙ্গল করতে আমার দিল চায়না হুজুর।

হাঁপাতে থাকে গোলাবী বাঈ, দুঃখে বেদনায় রক্তিমাভা ফুটে ওঠে তার মুখাবয়বে। মুবারক হুসেন গোলাবীর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—কেন গোলাবী, তোমার এত ক্ষোভ কেন, কিসের ব্যথা তোমার?

—মেহেরবান, আপনি আমাদের সকলের নবাব, আপনার চোখে তো সব ধরা পড়ে না, আপনি যাদের পরম যত্নে সর্বস্ব দিয়ে পোষণ করছেন তারাই রাতের অন্ধকারে আপনার কলিজায় ছুরি বসাবার সুযোগ খুঁজছে। এখানে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, এখানকার প্রতিটি পাথরের নুড়ি পর্য্যন্ত গুপ্তচরের কাজ করে। হারেমের প্রতি ঘরে ঘরে নবাবের বিরুদ্ধে চলে জেহাদ আর চক্রান্ত। স্বার্থের লোভে কুকুরের মত এরা ব্যভিচার করে বাইরের লোকের সাথে। নিজেদের ইজ্জত বিলিয়ে দেয় এক মুঠো আশরফির লালসায়! কি বলবো হুজুর, কত বলবো, ঘেন্নায় আমার গা রী রী করে ওঠে কিন্তু

তবু আপনাকে আমি বিরক্ত করতে চাই না এসব কথা বলে। একটা চাবুক, একটা চাবুকের দরকার। এই বেতমিজ বেগমদের আপনি শক্ত হাতে শাসন করুন জাঁহাপনা।

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে ক্লান্ত বোধ করে গোলাবী বাঈ, স্থির অচঞ্চল মুবারক গোলাবীকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। গোলাবী আবার বলে—জাঁহাপনা, আমার একটা জবানও যদি ঝুটা হয় তাহোলে আপনার ঐ পয়জার মাথায় করে তামাম এলাকায় ঘুরবো, কসম করে বলছি।

গত রাতের কথা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়েছে শাহানসা মুবারকের। আশ্চর্য্য এই নারী। দুর্জ্ঞেয় তার চরিত্র। শুধু দেহ আর রূপই এ নারীর সর্বস্ব নয়, রাজনীতিতেও অগাধ ব্যুৎপত্তি। সাব্বাস্।

মনে মনে খুব তারিফ করলেন গোলাবীর বুদ্ধিমত্তা দেখে। ভাবলেন একে কাজে লাগাতে হবে। একবার মনে হোল গোলাবীর রূপ ভাঙিয়ে অনেক আমীর উজিরকে খপ্পরে আনা যাবে। পরক্ষণে গোলাবীকে হারেমের বাইরের কোন কাজে লাগাতে বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠলো মুবারকের।

মীর মুবারকের জীবনে নারী কি শুধু অভ্যেস? শুধু নেশা, নারী কি তার জীবনের একটা বিরাট অংশকে নিয়ন্ত্রিত করছে না? আপন মনেই হিসেবটা মিলিয়ে নিতে চাইলেন তিনি। কিন্তু সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারলেন না। হৃদয়ের কোমল অংশে ভালবাসার সুরেলা তারটা আবার বেজে উঠলো, আপন মনেই বিড়বিড় করে উঠলেন—না না, গোলাবীবাঈ আমার হারেমের চিরাগ, আমার বেহেস্তের ফুল, আমার হৃদয়ের স্নিগ্ধ ভালবাসা দিয়েই ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রাজনীতির দুর্গন্ধ কালিমায় ওকে না জড়ানোই ভাল।

শাহানসা মীর মুবারক সারা ঘরময় পায়চারী করতে করতে গত রাতের কথাগুলি স্মরণ করতে লাগলেন।

আমীর আলী গওহর জবানের খেলাপ করেনি, ঠিক এসেছে রাতের অন্ধকারে গোসলখানার খিড়কি পথে। অন্ধকারে সিঁড়ি-গুলো ঠাহর করা যাচ্ছে না, ভয় ভয় লাগছে। যদি কোন কারণে আজকের খবর ফাঁস হয়ে মুবারকের কানে যায়, তবে সাক্ষাৎ মৃত্যু। খোদাতালাহও বাঁচাতে পারবে না তাকে। হঠাৎ একটা ছায়া দেখে চমকে উঠলো গওহর, কে, তবে কি আশমানতারা এলো! চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে। অন্ধকারে একটা ছায়া তরতর করে বেরিয়ে গেল খিড়কী পথে, গওহর ছায়ার পিছু যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, যদি দুশমণ হয়! কতটা সময় কাটলো ঠিক নেই, মশা কামড়াচ্ছে। এলোমেলোভাবে হঠাৎ একটা ফিসফিসানী শব্দে সচকিত হোল গওহর।

শব্দ শোনা গেল—গওহর,

—কে, আশমান!

—হ্যাঁ, তুমি কোথায়?

—এই তো!

ছোট্ট একটা আলো জ্বাললো আশমানতারা। একটা ঘরে গিয়ে বসলো দু'জনে। সাথে ওর বাঁদী, দুজনের দেহেই কালো বোরখা। আশমানতারার ইংগিতে বাঁদী একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলো, আর এদিকে আশমানকে জড়িয়ে গওহর বসে পড়লো পাশে।

অস্পষ্ট ফিস্ ফাস্ শব্দ। একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে গওহর, কোলে অর্দ্ধ শায়িতা আশমানতারা মীর মুবারকের একনিষ্ঠ বেগম।

ওদের কথা শোনা যাচ্ছে।

—বান্নু, এত দেরী করে এলে কেন, সেই কখন থেকে আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—বারে, আমি তো তোমাকে অর্দ্ধ রাত্রির কথা বলেছিলাম। তুমি এত তাড়াতাড়ি এলে কেন?

—তোমাকে দেখবো বলে মন কেমন করছিল বানু, তাই অপেক্ষা করতে তর সইছিল না।

—নাও খুব হয়েছে। মরদ হয়ে জন্মেছ কিন্তু জিন্দগীতে কিছু করতে পারলে না, সারা জীবন মীর মুবারকের গোলাম হয়েই থাকবে আর আমাকেও ওর সাথে রাত কাটাতে হবে। আল্লা যে কবে আমাদের একটু সুখ দেবে তা কে জানে!

—আচ্ছা, আচ্ছা সে হবে, তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, দ্যাখো সময় পেলেই ছুরি চালিয়ে দেব মুবারকের গলায়। এই তো সবে এত্তেলা এসেছে নবাব আলীমর্দ্দানের, যুদ্ধের সাজ শুরু হয়েছে, এইবার দ্যাখোনা কি রকম খেল্ শুরু করি।

—না, না, ওসব কথায় আশমানতারা ভোলে না, তোমার জবান বিশ্বাস করেই আমি এই হারেমের গোলামী করছি কিন্তু তুমি কিছুই করলে না গওহর, আমার জিন্দ্গী বিলকুল বরবাদ্ করে দিলে।

—আফশোষ ক'র না বিবি, বলছি তো এই সবে শুরু।

—শোন আমার শেষ কথা, আমি মুবারককে যুদ্ধে যাবার আগেই খতম করতে চাই।

—সেকি? কি ভাবে!

—জওহর, জওহর খাইয়ে

—পারবে?

—জরুর, আমিতো তোমার মত খোজা নই। শোন, আমি যা বলছি, যদি জওহর দিয়ে না পারি তবে লোক দিয়েই আমি কাজ হাসিল করবো, কিন্তু তার আগে দুটো কাজ তোমাকে করতে হবে এই তামাম এলাকার জায়গীর বিলকুল তোমাকে পেতে হবে, নবাবের হুকুমনামা আদায় করতে হবে, আলীমর্দ্দানের কাছে মদৎ দেখিয়ে প্রমাণ করতে হবে তুমি শক্তিমান, বিশ্বাসী, দেশের প্রজারা তোমাকে চায় আর মুবারক বেইমান, অপদার্থ উচ্ছৃঙ্খল।

—কিন্তু এটা কি করে সম্ভব আশমান ?

—কেন সম্ভব নয়। আমি আর কোন কথা শুনতে চাই ন গওহর, আমি তোমাকে মুবারকের জায়গায় দেখতে চাই। আর হ্যাঁ শোন, যাবার পথে মহজিদের উলেমা সাহেবকে একটু খবর দিও আমার সাথে তার জরুরী দরকার।

—তাকে কেন ?

—হ্যাঁ, উলেমা সাহেব আমাকে দোয়া করতে আসবেন এ রক কিছু বলে যেন আজকেই আমার সাথে দেখা করেন।

আশমানতারা উঠে দাঁড়ালো, আবেগে গওহর জড়িয়ে ধরলে আশমানকে। আশমান এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—

—সময় তো পালিয়ে যাচ্ছেনা সর্দ্দার সাহেব, অত তড়িঘড়ি কি আছে, সময় আসুক খোদা মেহেরবান যদি মুখ তোলেন তখন সব হবে।

দুটো ছায়া তরতর করে ওপরে উঠে গেল। গওহর মুহুর্তমাত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরক্ষণেই খিড়কী পথে বাইরে এলো।

আশমানতারা ঝটিকা বেগে নিজের ঘরে এসে হাঁফ ছাড়লো বোরখা খুলতে খুলতে বাঁদী বললো—হুজুরান্ আমার যেন কেমন ভয় করছে।

—চুপ কর।

ধমক দিল আশমানতারা। মরীয়া হয়েছিল সে, গওহরের সাথে দেখা তার করতেই হবে, আজ সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে। এই বার ওকে খেলিয়ে খেলিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হবে। হীরা, মুক্তা জহরৎ কিছু চাইনা তার, কিচ্ছুনা। কিন্তু শিক্ষা দিতে হবে মীর মুবারককে—চরম শিক্ষা, নারীকে অসম্মান করার, নারীত্বকে অবমাননা করার চরম প্রতিশোধ নিতে হবে।

—বান্দু, ... কদর্য্য জীবন কেটেছে তার।

তোমার জন্য, ... দান করেছে কত পুরুষের। নারীলোলুপ ঘৃণ্য পুরুষ

জাতটা কি ভাবে তাকে নিংড়ে নিংড়ে শোষণ করেছে। বহুকাল বহুদিন পর যদি বা মুক্তি মিললো তবু শান্তি কই।

ভেবেছিল মুবারকের হারেমে সে সম্মান পাবে, উপযুক্ত মর্যাদা পাবে, কিন্তু তকদীর তার কোনদিনই সুপ্রসন্ন হল না। মুবারক একদিনের জন্যও তাকে আদর করলোনা—কাছে ডাকলোনা, কেন তার এই অবজ্ঞা, এই বীতরাগ। প্রথম যে দিন মুবারকের সামনে কুর্নিশ করেছিল আশমানতারা সেদিনই মুবারকের চোখে মুখে ছিল বিরক্তির চিহ্ন। কেন, কি করেছে সে, কি তার অপরাধ? অস্থির হয়ে সারা ঘরময় পায়চারী করে আশমানতারা। বাঁদী পালংকে শুইয়ে ঘুম পাড়াতে চায় তাকে, কিন্তু এ জেনানা মহল তার কাছে বিষের মত লাগছে, এই হারেমে নিজেকে মনে হচ্ছে অবহেলিতা অপমানিতা, লাঞ্ছিতা।

আশমানতারার ছ'চোখ দিয়ে পানি ঝরে পড়লো। তাকিয়ে চোখ রগড়ে মনে মনে একবার খোদাতালার উদ্দেশ্যে বললো, দোয়াবন এই অভাগীর জীবনে কি চিরকাল অন্ধকার থাকবে, সবেরা হবে না, সুরুজ হাসবে না, সুখ আসবে না?

ঘোড়ার খুরে খুরে ধূলো উড়ছে।

বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে অশ্বারোহী সৈন্যদল আর পত্রবাহকেরা। গাজোল, পাণ্ডুয়া, আদিনার গভীর অরণ্য পথে বল্লম উঁচিয়ে কালাপোষ ফৌজের মত ছুটে চলেছে সিপাহীরা। সন্ধ্যার আগে পৌঁছতে হবে গন্তব্যস্থল পার্ব্বতীপুর, চিনির বন্দর, ঘোড়াঘাট অঞ্চলে। নবাব শাহানসার দরবারে হাজির হতে হবে সব্বাইকে, মীর মুবারকের হুকুম।

মুবারক জানতো তার হুকুম অগ্রাহ্য করার মত স্পর্ধা আজ আর কারও নেই। অথচ যেদিন নবাব শাহানসা আলীমর্দ্দান দিল্লীর

বাদশাহের সনদ নিয়ে গৌড়ের নবাবীয়ানায় বসলো, তখন গৌড়বঙ্গের তামাম প্রজারা কুর্নিশ জানিয়ে স্বীকার করে নিল নবাবকে, কিন্তু এলোনা শুধু সিঁদুরি, পুঁটিয়া, ভান্দসী অঞ্চলের জায়গীরদাররা। লোকমুখে শোনা গেল এরা বিদ্রোহী।

দরবারে বসেছিলেন নবাব আলীমর্দ্দান। সংবাদ পেয়েই ক্রোধে উগ্র হয়ে উঠলেন তিনি, হুকুম দিলেন সিপাহশালারকে, ফৌজ প্রস্তুত রাখতে. তিনি বিদ্রোহীদের সাথে মুকাবিলা করবেন।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যুবা মুবারক নবাবকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, জাঁহাপনা, গোলাম থাকতে আপনি কেন তকলিফ্ নেবেন হুজুর, আমাকে হুকুম দিন, আমি বেওকুফ বেল্লিকদের খতম করে আসি। খুশী হলেন নবাব আলীমর্দ্দান। পঞ্চাশজন দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী ফৌজ নিয়ে সিপাহী সর্দ্দার মীর মুবারক ছুটে চললো বরেন্দ্রভূমির দিকে, প্রায় সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছল চিলমারীর বন্দর অঞ্চলে।

পুরো দুদিনে তামাম এলাকা সাফ করে কিছু জীবিত, অর্দ্ধমৃত প্রজাদের বেঁধে হাজির করলেন তিনি গৌড় দরবারে।

নবাব শাহানসা প্রসন্ন হয়ে দরবারে সর্ব্বসমক্ষে পিঠ চাপড়ে বললেন—সাব্বাস্।

সেই থেকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মুবারকের আহ্বান পেলেই ছুটে আসে জমিদাররা তাদের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে। প্রজাপীড়ন করে, অত্যাচার করে ধন রত্ন সংগ্রহ করে ভেট দেয় মীর মুবারককে, খুশী করতে চায় তাকে।

গৌড়াধিপতি নবাব শাহানসা আলীমর্দ্দানকে তাদের ভয় নয়, ভয় এই ক্ষুদে পরাক্রমশালী অত্যাচারী মীর মুবারককে। অতীতের বীভৎস স্মৃতি আজও তাদের মনে জাগরুক রয়েছে।

লোকরব, এই আলীমর্দ্দান দোজক থেকে উদ্ভুত, শয়তানের দূত। অনেক দিন পর আবার এদের কাছে খবর পাঠালো মীর মুবারক। এবার গৌড়ের দরবারে নয় স্বয়ং নিজ এলাকা নবাবগঞ্জের মঞ্জিলে।

নবাবই-জহান শাহানসা আলীমর্দ্দানের কানে পৌঁছলো মীর মুবারকের আস্পর্ধার কথা, খোয়াবের কথা—সে নবাব হতে চায়।

আলীমর্দ্দান এই দুঃসাহসী সিপাহীটির মধ্যে দেখেছে অসীম সাহস, দেখেছে প্রভুভক্তি আর প্রচণ্ড বীর্যবত্তা। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু গুপ্তচর যখন খবর আনলো মীর মুবারক বিভিন্ন অঞ্চলে শাহানসা, জাঁহাপনা, নবাব বলে অভিহিত হচ্ছে তখন মনের মধ্যে ঈর্ষার সাপটা ছোবল দিয়ে উঠলো। নিজের কথা মনে পড়লো তার। কি জানি মীর মুবারক যদি তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তবে! কোন জিজ্ঞাসাকে তিনি নিজের মনে ধরে রাখতে চান না, সমাধান চান তিনি। তাই খবর পাঠালেন মুবারকের কাছে। তিন দিনের মধ্যে দেখা করতে হবে এই গৌড় দরবারে এসে।

এত্তেলা পেয়েই মুবারক ছুটলো নবাবের সাথে দেখা করতে। ভাবলো নিশ্চয়ই কোন সুখবর অপেক্ষা করছে তার জন্যে কিন্তু গিয়ে দেখলো নবাব অসন্তুষ্ট। মুহূর্ত্ত মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললো মুবারক, নবাবের পদপ্রান্তে বসে তার ওপর নারাজ হবার কারণ জানতে চাইলো সে, বললো, হুজুর খোদাবন্দ্ আমি আপনার গোলাম, সারা জিন্দগী আমি গোলামই থাকবো, কি কসুর হয়েছে, বলুন জাঁহাপনা। হুজুর হুকুম করে দেখুন আমি আপনার জন্য জান পর্যন্ত কোরবাণী করতে পারি জাঁহাপনা।

দু'চোখে পানি এনে ফেললো মুবারক।

বিস্ময়ে হতবাক হলেন সম্রাট গৌড়াধিপতি।

তাই তো, চরম বিপদের দিনে এই মুবারকই তো তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে, হুকুম তামিল করতে জান কবুল করেছে, এত পরিশ্রমের পর যদি একটু বিলাসব্যসনে মত্ত হয় তবে তো সেটা অপরাধ নয়। করুণায় ভরে গেল নবাবের মন, পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত মুবারকের হাত ধরে টেনে তুললেন তিনি, বললেন, অপদার্থ, মরদ হয়ে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছ, সরম করে না!

—আপনার কাছে আমার কোন সরম নেই জাঁহাপনা, কারণ

আপনি আমার জীবনে আলোর রোশনাই এনেছেন, আপনি আমার মালিক, ধরা গলায় বললো মুবারক। গর্জ্জে উঠলেন সম্রাট, ভেবেছ কোন খবরই আমি রাখিনা, এলাকায় গিয়ে নবাব বনেছ, শাহানসা হয়েছ, তাই না ?—নীরব মীর মুবারক।

হঠাৎ মীর মুবারকের কাঁধে হাত দিয়ে আলীমর্দ্দান বলে উঠলো, যাও, আজ থেকে তুমি আমার ইয়ার—দোস্ত। কিন্তু কসম কর, জিন্দ্‌গীতে কোন দিন আমার বিরুদ্ধাচারণ করবে না। যদি কথার নড়চড় হয় তবে তোমার জান আমার কাছে জামানত রইলো। আজ থেকে তুমি নবাবগঞ্জের সামসী এলাকাসহ তামাম এলাকার পুরোপুরি মালিক, শুধু আমার এত্তেলা পেলে এসে দেখা করবে, আর বছরে চার বার দিয়ে যাবে তোমার নির্দ্ধারিত রাজস্ব।

আবেগে হত বিহ্বল মীর মুবারক কি করবে বুঝতে না পেরে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলো আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নবাব আলীমর্দ্দান সবল ছ'হাতে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন মুবারককে, বললেন, যাও মুবারক শীঘ্রই আমার ফরমান পাবে, সামসীর তামাম এলাকা তোমার জায়গীর। হতবাক হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিল মুবারক।

সম্রাট পায়চারী করতে করতে ভাবলেন, কাজটা ঠিক হোল কিনা! হিসেব মিলাতে গিয়ে দেখলেন, নাঃ অনেক খুন অনেক জান খতম করেছে মুবারক, এবার ওর মুখে যদি একটু হাসি ফোটে, তবে আল্লা নিশ্চয়ই আমার রহম করবে।

অপরিসীম আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেন নবাব। সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর থেকেই যুদ্ধ আর রক্ত, শত্রুতা আর হিংস্রতা। দরবারে আশে-পাশে যারা সব সময় তাকে ঘিরে রেখেছে তারা কেউ তার আপনজন নয়, স্বার্থের গোলাম। সুযোগ পেলেই ছোবল মারতে কসুর করবে না। আলীমর্দ্দান জীবনকে জেনেছেন

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, শঠতার রজ্জু বেয়ে বেয়ে তার এই উত্থান। তাই এই মানুষগুলিকে তার চিনতে ভুল হয়নি। কিন্তু মীর মুবারকের স্বাতন্ত্র্য আছে, যদিও সে স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় নবাবীর খোয়াব দেখছে তবু মুবারক পরিশ্রম করে তার পাওনা পেতে চায়। আর অন্যান্য মানুষগুলো সব ঝুটা, সব মেকী, রাতের অন্ধকারে চলবার মত অচল পয়সা মাত্র।

নবাব আলীমর্দ্দান পায়চারী করতে করতে নিজের কথা ভাবছিলেন। কে তিনি, নবাবীযানায় কি তার অধিকার। সবই সেই করুণাময় বিশমিল্লা আল্লাহ্‌তালার হুকুম। তাই মীর মুবারকের ওপর ক্ষমতা অর্পণ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলেই বিবেচনা করলেন তিনি।

ইকতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খলজির সৈন্য বিভাগের একজন দীন অতি সাধারণ সৈন্য যদি গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হতে পারে, তবে মীর মুবারকের ভাগ্যে নবাবগঞ্জের কর্ত্তৃত্ব পাওয়া মোটেই অন্যায় নয়।

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে হাসি পেলো নবাব শাহানসার। গজনীতে বন্দী জীবন, লাহোরের যুদ্ধ, তিব্বতের যুদ্ধ তাকে দিয়েছিল অসীম শিক্ষা, আর ক্ষুরধার বুদ্ধি। তাই মীর মুবারকের মত পতঙ্গের সামনে সব সময় একটু আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়, বিভ্রান্ত করে রাখতে হয়, সময় মত আগুনের লেলিহান শিখা ওর সামনে ধরলেই হবে।

দহিল-মহিল থেকে নবাবগঞ্জে দরবার বসানোর আয়োজন হচ্ছে জাঁহাপনা মীর মুবারকের। নূতন জনপথ গড়া হবে এখানে। যারা মীর মুবারকের ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষায় জ্বলছিল তারাও মুবারকের পাশাপাশি এসে সাহায্য করবার অছিলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছু করুণার ছিটেফোঁটা, অনুকম্পা যদি মেলে সেই ভরসায়।

শাহানসা মীর মুবারক পেশোয়ারী কারিগর আর মিস্ত্রীদের কাজে লাগিয়েছেন, সুন্দর করে হারেম বানাতে হবে, দরবার বানাতে

হবে, দরবারের খিলানে থাকবে সূক্ষ্ম কাজ। জাফরী কাটা হবে বেগম মহলে।

কাজ চলেছে অবিরামভাবে, সারা দিন সারা রাত। শাহ মুশার ওপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন নবাব স্বয়ং। তাঁর নিজের সময় নেই, শুধু বিদ্রোহ আর বিপ্লবের সংবাদ, চারদিক থেকে তাকে বিভ্রান্ত করে রাখছে।

মীর মুবারক নবাবগঞ্জের মালিকানা পাবার পর একবারও গোলাবী বাঈ-এর কাছে যাননি, যেতে পারেননি। তাঁর মনে হোল এ সুখবরটা তাকে দেয়া দরকার। অনেক আগের একটা কথা হঠাৎ আজকে মনকে রাঙ্গিয়ে দিল, মীর মুবারক চোখ বন্ধ করে অতীতকে দেখতে চাইলেন। অনেক দিন আগের কথা।

মীর মুবারকের বয়স তখন আঠারো কি উনিশ। বাজারের মধ্যে এক বৃদ্ধ ঝুড়িওয়ালা দরবেশ, সারা দেহে ছিন্ন বস্ত্রের তালিমারা আলখাল্লা, বিরাট দাড়ি গোঁফ, রক্ত চক্ষু, পাগলের মত দেখতে। এই পাগল দরবেশটি হঠাৎ একদিন মীর মুবারকের হাত দুটি বজ্র মুষ্টিতে ধরে বলেছিল—

—বেটা, তু নবাব বনেগা, খোদাকে সেলাম কর। সেই বাজখাঁই গলার শব্দে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল মুবারকের। কি ভীষণ গম্ভীর কণ্ঠস্বর, আর কি ভয়ঙ্কর শক্তি ঐ হাতে, যেন মুবারকের হাত গুঁড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলেছিল প্রায়।

অনেক দিন মীর মুবারক হঠাৎ কি ভাবে প্রাণ খোলা হাসিতে ভরিয়ে তুললেন নিজের বিশ্রাম কক্ষ।

সন্ধ্যা উতরে গেছে অনেকক্ষণ। আজ নবাব মীর মুবারকের মন খুশীর আমেজে ভরপুর হয়ে আছে, অনেকক্ষণ থেকেই গোলাবী বাঈ-এর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, কিন্তু সময় হচ্ছে না। একা থাকতে দেয় না এরা। এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত

থেকে এসেছে সওদাগরবৃন্দ, মোড়ল, প্রধান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। নবাবকে সেলাম জানাতে, খুশীর মোবারক জানাতে। নবাব নূতন রাজ্য সামসীসহ তামাম নবাবগঞ্জের আমিরী পেয়েছেন, গৌড় নবাবের পেয়ারের লোক হয়েছেন, একি কম সৌভাগ্যের কথা।

মহফিল শেষ হতে হতে তাই এত দেরী।

মীর মুবারক ডেকে পাঠালেন শাহ মুশাকে, নবাবগঞ্জের মহল শেষ হতে আর কতদিন!

পাণ্ডুয়ার দরবেশ বসে নেই। গ্রামে গ্রামে ঘুরে অত্যন্ত সন্তর্পণে কাজ করে চলেছে। মীর মুবারকের অত্যাচার, অনাচার, বিধর্মীর ওপর সুনজর প্রভৃতি রটনা করে করে এগিয়ে চলেছে সে। অনেক আশরফির ইমান ওকে লোভার্ত করে তুলেছে। শুধু কি ইনাম! এই ফকিরীর অন্তরালে যে ছদ্মবেশ তা যদি ওরা প্রকাশ করে দেয়, তবে জান নিয়ে টানাটানি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ভর দুপুর, নিমাসরাইর মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক মসজিদের সামনে এসে দাঁড়াল দরবেশ। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর, তৃষ্ণার্ত। একটু পানির খোঁজ করতেই বেরিয়ে এল পাড়ার মুরুব্বি মাতব্বররা। ভরপেট পানি খেয়ে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হল ফকীর সাহবের কিন্তু মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠলো আলী গওহরের হিংস্র মূর্ত্তি। ঝোলা থেকে কাগজ বের করে মিলিয়ে দেখলো আর কোথায় কোথায় আজকের কাজ শেষ করতে হবে। আলী গওহরের নির্দ্দেশমত ঘুরে ঘুরে কাজ করে চলেছে, এই সাত দিনের মধ্যে তামাম এলাকার নামজাদা লোকেদের নিয়ে গোপন মহফিলের আয়োজন করতে হবে। আলী গওহর স্বয়ং এই গোপন মহফিলে উপস্থিত থেকে এদেশের জনসাধারণের আশু কর্তব্য সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেবেন, প্রয়োজনে অত্যাচারী মীর মুবারকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেও দ্বিধা করা হবে না, এই নির্দ্দেশ পৌঁছে দেয়াই ফকীরের একমাত্র কর্তব্য।

ভীষণ সমস্যায় পড়েছে ফকীর। একদিকে আলী গওহর আর

আশমানতারার রক্ত চক্ষু, অপর দিকে এই ঘটনার বিন্দু-বিসর্গ যদি নবাবের কানে পৌঁছয় তবে ফকীরের দুনিয়াদারী এক লহমায় শেষ। দ্বিপ্রহরের পথ চলতে চলতে বৃদ্ধের দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরে পড়লো। দু'হাত জড়ো করে আসমানের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো—আল্লা, রহম কর, দোয়া কর, আল্লা আমাকে রহম কর।

মাত্র বারো কি তের বছর বয়েসে পানি আনতে গিয়ে আর বাড়ী ফিরে যেতে পারেনি আশমানতারা, সে চুরি হয়েছিল, তারপর অনেক হাত ঘুরে মীর মুবারকের হারেমখানায় তার স্থান হয়েছে। তাকে অনেকে বেগম বলে সোহাগ করে, আদর করে কিন্তু সেতো নিজে জানে নিজেকে। জারিয়াদের চেয়েও হীন হয়ে এখানে সে বাস করছে। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়েসেই আলীরেজা মোহব্বতে পড়লো আশমানতারার, নিজের চাচার বেটি আশমানতারা কিছুতেই প্রশ্রয় দিল না আলী রেজাকে, ফিরিয়ে দিল ওর দেওয়া মুক্তোর মালা, গোলাপের ফুল আর যৌবনের ধন ভালবাসাকে। গোঁসা হল আলী রেজার, অনেক মিনতি করে যখন আশমানতারার মন পেলোনা, কখন চুরি করে দূরে নিয়ে গিয়ে সাদী করার ব্যবস্থা করলো সে। গোপনে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে লোক ঠিক করে আশমানতারাকে পানি আনতে যাবার সময় পথে চুরি করান হোল। তাতেও আলী রেজার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোলনা। যারা চুরি করে নিয়ে গেল ওর প্রাণপ্রতিমাকে তারা অর্থও নিল আশমানতারাকেও নিল।

ঘটনাটা জানাজানি হতে দেরী হোলনা। প্রাণভয়ে ভীত আলী রেজা দেশ ছেড়ে বৈরাগী হোল, খুঁজে খুঁজে হয়রান হলো সারা মুল্লুক, পেশোয়ার থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে বাংলা এই গৌড় দেশ। তামাম এলাকার খবর নিতে নিতে হঠাৎ একদিন অবাক হোল আলী রেজা। হ্যাঁ, মিলেছে, মিলেছে, এই তার সেই প্রাণের পুতুলী, মোহব্বতের সাথী, সেই চোখ সেই মুখ সেই হাসি। সাহসে ভর করে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল কাছে; কিন্তু শুনতে পেলো চারদিক

থেকে হাসির হিল্লোল। অগুনতি মেয়ে ছেলে রং বেরংয়ের পোষাক পরে বিচিত্র ঢংয়ে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে, ঠাহর করতে পারলোনা আলী রেজা। জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে পথে পথে। আশমানতারার সন্ধানে। সারা মুখে মস্ত বড় দাড়ি, মাথার চুল অবিন্যস্ত হয়ে ঝুলে পড়েছে কাঁধ অব্দি। চেনা যায় না আলী রেজাকে। এ পাড়ায় এ ধরনের লোক দেখলে কারইবা না হাসি পায়। একটি মাঝ বয়সী বিবি চীৎকার করে উঠলো--আরে মরদের সওখ তো কম নয়, ভুতের সাজ সেজে মজা লুটতে এসেছে এখানে, যা-যা ভাগ এখান থেকে, কান করলোনা আলী রেজা ও-কথায়। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক সেই মেয়েটির কাছে এসে, ধীর কণ্ঠে বললো—বিবি তোমার সাথে আমার কিছু গোপন বাৎচিৎ আছে। তুমি একটু আমাকে তোমার ঘরে বসতে দেবে ?

কেমন একটা কৌতূহলে ভরে গেল আশমানতারার মন। চারদিকে বিদ্রূপ, হাসির ফোয়ারা, তবু তার মধ্য দিয়েই আশমানতারা আলী রেজাকে ঘরে নিয়ে তুললো।

দু'টি হাত ধরে দীর্ঘ সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো আলী রেজা, তাঁর প্রণয়াসক্ত পুরুষ। লাখোবার আল্লাহতালার নামে কসম করে বললে—সে নির্দোষ। বেইমানরা আশমানতারাকে ফিরিয়ে দেবেনা একথা সে বুঝতে পারেনি। বুঝলে একাজ সে কখনই করতো না। সমস্ত ঘটনাই বলল আলী রেজা। অবাক, হতবাক হল আশমানতারা। তাহোলে এই আলী রেজাই তার বিড়ম্বিত জীবনের ভাগ্য রচয়িতা। হিংসায় ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠলো আশমানতারার চোখ। শানিত ছুরি আমুল বসিয়ে দিতে চাইলো আলী রেজার হৃদয়ে। চাচাতো ভায়ের টাটকা খুনের স্বাদ পেতে চাইলো আশমানতারা। ক্রুদ্ধা নাগিনী কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল ক্ষণিকের জন্য। "কি আছে তার! আত্মীয়-স্বজন সবাই তার জীবন থেকে সরে গেছে। অনেকে মৃত। যারা দু'একজন আছে তারা অনেক সুদূরে। তাদের সাথে যোগাযোগের কোন সম্ভাবনাই নেই। বেদনায়

ভরে গেল আশমানতারার মন। নারী হৃদয় অশ্রুসিক্ত হোল অতীতের কথা স্মরণ করে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা আলী রেজাকে তুলে বললো—যাও, বেরিয়ে যাও আমার মহলা থেকে। আমার জিন্দগীকে তুমি বরবাদ করেছ, আমার যৌবন নিজেও ভোগ করতে পারনি, আমাকেও ভোগ করতে দাওনি। খোদাতালা পাপের বিচার করবেন। হাঁপাতে থাকে আশমানতারা।

আলী রেজা কাঁদতে থাকে, ক্ষমা ভিক্ষা করে বার বার। তারপর কসম করে, এ জায়গা থেকে সে তাকে মুক্ত করবে। মস্ত বড় জায়গায় নিয়ে তুলবে। অনেক সুখ স্বপ্নের কথা বলে আলী রেজা। কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস আসে না আশমানতারার। কাপুরুষ মরদ, নিজে ছিনিয়ে নিতে পারেনি নারীর যৌবন, অন্যের সাহায্যে চুরি করে সাদী করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, সে আবার সুখের স্বপ্ন দেখে! বেয়াকুফ!

আলী রেজা আর একবারের মত সুযোগ চাইলো, লক্ষ বার মিনতির পর মন নরম হোল আশমানতারার। তারপরের ইতিহাস…

আশমানতারা শাহানসা মীর মুবারকের হারেমে বেগম বলে কথিত, আর গোপনে আলী গওহরের সাথে প্রণয়াশক্ত। মুবারককে খতম্ করে আলী গওহরকে নিয়ে ঘর বাঁধবার খোয়াব তার মনে।

আর আলী রেজা এখন উলেমা-ফকীর। আদিনা পাণ্ডুয়া অঞ্চলের মসজিদে তার আস্তানা। কোন ক্রমে দিন গুজরাণ করে মাত্র। আশমানতারার ঘর থেকে কসম করে ফিরে আসার পর থেকে ফকীর সেজে হেকিমি করে সিপাহীদের মনোরঞ্জন করতে করতে আলী গওহরকে একদিন নিয়ে গেল আশমানতারার মহলে।

সিপাহী সর্দার আলীগওহর খান মুগ্ধ হোল আশমানতারার নাচ দেখে, কথা শুনে। তারপর চললো নিত্য যোগাযোগ। অনেক আশরফি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আশমানতারাকে পঙ্ক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করলো আলীগওহর, নিয়ে তুললো মুবারকের লালসা-বহ্নির সম্মুখে।

আলী গওহর প্রচুর ইনামের বিনিময়ে আশমানতারাকে তুলে দিল মুবারকের হারেমে আর আশমানতারাকে বললো—তুমি ভেতর থেকে আর আমি বাইরে থেকে কৌশিস্ করে মুবারককে হাটিয়ে দেবো। তুমি আমার বেগম হবে আর আমি তোমার নবাব।

স্বপ্ন দেখে আশমানতারা। আমিরী পেয়েছে আলী গওহর আর তার বেগম হয়েছে আশমানতারা। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তার এই স্বপ্নকে সফল করার জন্য চেষ্টা করে চলেছে সে। আর আলী গওহর শুধু অভিনয় করে চলেছে আশমানতারার সাথে। সে জানে মীর মুবারকের চোখের ইংগিতে তার শির মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারে, তাই বাইরে সে নীরব। কিন্তু আশমানতারার সামনে সে খুব সক্রিয়, খুব সচেষ্ট।

আশমানতারার প্রণয়ী, চাচাতো ভাই ফকীর আলী রেজা। গ্রাম গ্রামান্তরে সে ছুটে চলেছে আলী গওহর আর আশমানতারার হুকুম মত কাজ করতে। অতীত তাঁর কাছে স্পষ্ট, সজীব এখনো। সারা জীবন ভুল করেছে সে। যৌবনের আবেগে একবার দস্যুদের হাতে তুলে দিয়েছিল তার প্রাণের বিবিকে, আর এখন সেই একই ভুলে তাকে তুলে দিল আলী গওহরের হাতে। গওহর কি সত্যিই আশমানতারাকে ভালবাসে? না কি মীর মুবারকই আশমান-তারাকে ভোগ করতে চায়। কিছুই ঠাহর করতে পারে না ফকীর, কিন্তু আশমানতারার জন্য তার ভীষণ কষ্ট হয়। কিছুই পেলোনা মেয়েটা। জিন্দগীটা বিলকুল বরবাদ হয়ে গেল। একটা পেশোয়ারী ফুল। ফুটবার শুরুতেই পোকায় কাটলো, না পারলো ফুটতে, না হোল ফল।

আশমানতারার তের বছরের যৌবনশ্রীর কথা মনে করে হঠাৎ পথ চলতে চলতে থমকে নীল আকাশে ভেসে থাকা একখণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলো ফকীর—আশমানতারাকে রহম কর, রক্ষা কর, খোদা ওকে বাঁচাও।

নবাবগঞ্জের প্রস্তুতি শেষ।

বন কেটে বসত হচ্ছে চারদিকে। অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় দরিদ্র প্রজারা এসে জুটছে নূতন জনপদের আশে পাশে।

নবাব মঞ্জিলের ভাস্কর্য অতুলনীয়। এখানে শাহানসা মীর মুবারক নিজে থাকবেন। মঞ্জিলের পাশে দীঘি, গোপন গোসলখানা। উদ্যানের মত করে সাজানো ফুলবাগিচার ভেতরে ভেতরে এই দীঘিতে স্নান করবে হারেমের বিবিরা। আর গোপন রন্ধ্র পথে বিবস্ত্ররূপ অবলোকন করবেন নবাব স্বয়ং। কেউ জানবে না, বুঝতেও পারবে না এই ব্যবস্থার কথা।

নবাব মঞ্জিলের পাশেই গোলাপ বাগ। রকমারী ফুলের বাহার এখানে। কিছু হরিণ শিশুর মেলা।

দীন দরিদ্র প্রজাদের চোখ ঠিকরে পড়ে, তারিফ করে অনেকে বলে, সত্যি নবাবের নজর আছে, দিল আছে। জঙ্গল কেটে চান্দের হাট বসিয়েছে এখানে।

মীর মুবারকেরও বেশ ভাল লাগে জায়গাটা। জীবনে মুহূর্তমাত্র অবসর মেলে না, শুধু কাজ আর কাজ। তবু কিছুটা সময় যদি এখানে বিশ্রাম মেলে। যদি কিছুটা সময় ফুলের হাসির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারা যায়, তবেই তো আনন্দ।

শাহানসা মুবারকের গোলাবী বাঈ-এর কথা মনে এল। সে বলেছিল, জাঁহাপনা, কথা দিয়েছেন আমাকে কোনদিনই ভুলবেন না, আমাকে পেয়ার করেন, আমি আপনার জীবনসর্ব্বস্ব। কিন্তু জাঁহাপনা আপনাদের মুখে কি একথা মানায়?

—কেন! অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল মুবারক।

—কেন, জানতে চাইছেন! তামাম মুল্লুকের লোক আপনার কাছে আরজী পেশ করার জন্য দরবারে দাঁড়িয়ে থাকে। গুপ্তচরেরা গোপন খবর নিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত। বিদ্রোহ...

বিক্ষোভ, দুশমনী, হারেম—সব মিলিয়ে ভালবাসার জন্য সময় দিতে পারবেন জাঁহাপনা ?

হাসিতে মুক্তো ঝরে গোলাবীর। সুন্দর করে গুছিয়ে টেনে টেনে সুরেলা কণ্ঠে যখন কথা বলে তখন মনে হয় যেন সুর ভাঁজছে। ওর কথা মুগ্ধ হয়ে শোনে বীর মুবারক। তারপর ওর চিবুক স্পর্শ করে বলে—তুমি ঠিকই বলেছ বেগম, আমার জীবনে শুধু সংগ্রাম আর ব্যস্ততা। দিল দেয়া নেয়ার সময় আমার নেই। কিন্তু বেগম তোমাকে পাওয়ার পর থেকে আমার বাইরের কাজ অনেক কমেছে। এখন প্রায়ই মনে হয় দু'দণ্ড তোমার কাছে এসে বসি, কথা বলি, আনন্দ করি।

—না জাঁহাপনা। এখনো সে সময় আপনার আসে নি। এখনো প্রচুর দুশমন আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। পরখ্ করে করে দোস্ত অথবা দুশমন এগুলোকে আগে চিনে নিন্। দিজ এলাকা কণ্টক-মুক্ত করুন তারপর বিলাসের কথা ভাববেন। ভোগ বিলাস তো সহজলভ্য বস্তু। আপনার চোখের ইংগিতে হাজারো নারী আপনার পদপ্রান্তে এসে লুটাবে, সুযোগ সন্ধানী ইয়াররা পাশে বসে সরাবী মুখে তুলে ধরবে। কিন্তু জাঁহাপনা চরম বিপদ যদি আসে সেদিন যে-ক'জনের সাক্ষাৎ পাবেন তারাই তো আপনার সঠিক দোস্ত্।

অবাক হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত গোলাবী বাঈয়ের কথা শুনছিল মুবারক। আনন্দের আতিশয্যে গোলাবীকে জড়িয়ে ধরে সহসা বলে উঠেছিলেন—বেগম তুমিই আমার মহলের সাচ্চা মতি, সাচ্চা জহরৎ। বিপদে তুমিই আমার ভরসা হও বেগম, তুমিই আমাকে পথ দেখাও।

গোলাবী জানে এ তারুণ্যের আবেগ। ভাললাগার উজ্জ্বলতা। কিছু বলেনা গোলাবী, শুধু মিষ্টি হেসে নবাবের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে—জাঁহাপনা আপনি ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করুন।

—হ্যাঁ আমি বিশ্রাম করতে চাই বেগম, আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

—জাঁহাপনা, যদি অনুমতি করেন তবে কিছু খাবার ব্যবস্থা করি ?

—না, না দরকার নেই বেগম,বরং চল তুমি আমাকে নাচে-গানে ভরিয়ে তোল। সংসারের কঠিনতা থেকে আমাকে তোমার প্রেম সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। মুবারকের কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে গোলাবী। তারপর নাচের প্রস্তুতি নেবার জন্য পাশের ঘরে এগিয়ে যেতেই ডাক দেয় মুবারক। ফিরে তাকায় গোলাবী বাঈ।

—না, থাক। নবাবগঞ্জের গোলাপবাগেই তোমার প্রথম নাচ গান উপভোগ করবো বেগম। আজ নয়। মীর মুবারক আপন মনেই বেরিয়ে আসে গোলাবীর ঘর থেকে।

একটা তীব্র চীৎকারে মীর মুবারকের চিন্তার রজ্জু খান খান হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে ভালই লাগছিল তার। কে এই বেতমিজ, বেল্লিক। তীব্র চীৎকারে তার সুখ-স্বপ্নটা ভেঙে দিল। মুবারক বিরক্তিতে ডাক দিলেন কৌন হ্যাঁয় ? নফর তসলিম জানিয়ে নিকটে আসতেই তিনি ধমকে উঠলেন, কৌন্ চিল্লায়া, উনকো লে আও। কুত্তাটা আদপ জানে না।

নবাবগঞ্জের সীমানা-চৌহদ্দি জরীপের কাজে সিপাহীরা ব্যস্ত। মীর মুবারক ভাবছিলেন এখানে কাজ শুরু করার আগে নবাব আলী মর্দ্দানকে যদি একবার কোন ক্রমে দাওয়াত করে আনা যায় তবে কেমন হয়। কিন্তু গোলামের এ আরজীতে নবাব কি রাজী হবেন ? ডাকবেন কিনা মনস্থির করতে না পেরে সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন শাহানসা মুবারক।

একবার মনে হোল তার এই সমৃদ্ধির মূলে যদিও বা সম্রাট আলীমর্দ্দান তবু এই রাজকীয় প্রাসাদ, এই গোলাপবাগ নবাবকে হয়ত ঈর্ষান্বিত করে তুলতে পারে। সামান্য একজন সিপাহী থেকে সিপাহীর সর্দ্দার, মনসবদার, আমীর, এখন একটা বিরাট ভূখণ্ডের

বাদশা। শুধু নামমাত্র রাজস্ব দিয়েই নবাবের সাথে সম্পর্ক শেষ। মুবারক স্থির করে ফেললেন—না, আলীমর্দ্দানকে আহ্বান জানিয়ে কাজ নেই। পরে জানালেই চলবে। অবশ্য মুবারকই কি শুধু সিপাহী থেকে নবাব! আলীমর্দ্দানও কি তাই নন্?

খোজা বান্দা আর বাঁদীদের ইমান দিয়ে আলী গওহর আবার রাতের অন্ধকারে আশমানতারার ঘরে ঢুকলো।

আশমানতারা গওহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আদরে আদরে দিশেহারা করে তুললো আলী গওহরকে। ওর গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসে বললো—শুনেছ সব খবর?

কোন্ খবর? শুধাল আলী।

—বারে, কিছুই জান না নাকি, এই বুদ্ধি নিয়ে সিপাহীদের সর্দ্দার হয়েছ!

—আরে বিবি তুমি চটছ কেন! খবর আমার কাছে আছে তামাম মুল্লুকের। তুমি কোনটা জানতে চাও তাই খোলসা করে বল।

—নবাবের নূতন এলাকায় নাকি হারেম উঠে যাচ্ছে?

—হারেম ঠিক উঠছে না, তবে এই মুহূর্তে শুধু গোলাবী বাঈ যাচ্ছে সেখানে। তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে গেলে তোমাদের পালা।

আলী গওহরের কথা শুনে কপাল কুঞ্চিত করে আশমানতারা বললো—খুব সুখবর নিয়ে এসেছ দেখছি। আর এদিকে আমাদের কি করলে?

—কি করবো, চল সবাই মিলে নবাবগঞ্জে যাই। তারপর সময় বুঝে যা করার, তাই করা যাবে।

ঘৃণায় মুখ বাঁকাল আশমানতারা। রাগতস্বরে বলে উঠলো—তোমার মত ডরপোক মরদ আমি জিন্দেগীতে দেখিনি। তোমার সাথে কথা কইতেও আমার শরম আসে।

কথা শুনে রাগ করেনা গওহর, শুধু হাসে। সে জানে আশমান-তারার মাথার ঠিক নেই। মুবারকের বিরুদ্ধে ওর এই আস্ফালন শুধু বাতুলতা মাত্র।

তাছাড়া ওর পেয়ারের বেগম খালিদা বানু রোজ ওর প্রতীক্ষায় দিন গোনে, গওহরকে না খাইয়ে দাঁতে দানা কাটে না। সেই ত'র নবাবী বিবি।

আশমানতারা মরীয়া হয়ে কঠোর বাক্যবাণে বিদ্ধ করে চলেছে আলী গওহরকে। কিন্তু সে শান্ত, কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নেই। শরীর স্থির অচঞ্চল। আশমানতারা সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে দেখে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো। আলী গওহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো—আলী, আমার গোস্তাকী মাপ কর। তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও—সেবার যেমন উদ্ধার করেছিলে, এবারেও আমাকে বাঁচাও। খোদার কসম করে বলছি আমি এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবো। আমার জিন্দ্‌গী বরবাদ হয়ে যাবে। তুমি তো জানো আমি ভালবাসার কাঙাল। প্রেম আর মহব্বতের কাঙাল। আমি জেনানা হয়ে মান-মর্যাদা খুইয়ে একথা বলছি। তোমার কাছে মহলা চাই না, আশরফি চাই না, শুধু বাইরের দুনিয়ার আলো দেখতে চাই, চাঁদ-সুরজ দেখতে চাই, আলী।

গওহর আশমানতারার আকুতি দেখছে। নারীত্বের অবমাননা হলে নারীর রূপ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে আগে সে তা বুঝতে পারেনি। মুবারকের একটু স্নেহ-করুণা পেলে এই নারীই হয়ত হয়ে উঠতো পূর্ণ, কিন্তু অবজ্ঞায় অবহেলায় সে আজ এখান থেকে মুক্তি চাইছে, আলো চাইছে।

আলী গওহর আশমানতারাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো,—আশমান, জবান করে যাচ্ছি, তিনদিনের মধ্যে একটা কিছু করবোই। খোদার কসম।

খলিদা বানু আলী গওহরের পাশে এসে দাঁড়াল।

অন্যমনস্ক আলী বানুর উপস্থিতি টেরই পায়নি। ওর ডাকে সচকিত হল গওহর।

—কি ভাবছো খাঁ সাহেব, এত গভীরভাবে! মিষ্টি হেসে শুধালো খলিদা। সোহাগ করে ওকে কাছে টেনে আদর করতে করতে আলী বললো—বাণু, একটা মস্ত বড় মুশকিলে পড়েছি, কি যে করবো বুঝতে পারছি না। দুশ্চিন্তাজড়িত কণ্ঠে খলিদা চনমনিয়ে উঠলো, তারপর আলীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললো—বলো না খাঁ সাহেব, কি হয়েছে তোমার? লড়াইয়ে যাবার হুকুম বুঝি, তাই তবিয়ত খারাপ!

—লড়াই, বিবি লড়াই, গুরুগম্ভীরভাবে বললো আলী। এ লড়াই বাদশা-বাদশার লড়াই নয়—অন্য লড়াই।

—কি রকম!

—এর কোন ছক বাঁধা রকম নেই। একদিকে একটা গুলি খাওয়া বাঘ হিংসায় দিনরাত গর্জ্জাচ্ছে, অপর দিকে একটা ছোট্ট হরিণ শিশু পরম শান্তির স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে। শিকারী বেচারা না পারছে বাঘটাকে মারতে, না পারছে হরিণকে ধরে আনতে।

—ধ্যৎ, কি যা তা বকছ খাঁ সাহেব। তোমার মাথার ঠিক নেই। খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো খলিদা বাণু। বললো—তোমার এই সব প্যাঁচ্ দেয়া জবান আমি বুঝতে পারি না। খোল্‌সা করে বলবে তো বল, তা-নইলে চলে যাবো। খলিদা চলে যেতেই খপ করে হাত ধরে ফেললো আলী, মুখে একটা চুক্‌চুক্ শব্দ করে বললো, আহা বেগম চটছ কেন! তুমি চলে গেলে কি করে বাঁচবো বিবি।

—আহা-হা যতসব ঢংয়ের কথা। সব মরদরাই খালি মুখে বড় বড় বাত বলে, কাজের বেলায় ফক্কা।

—সেকি, বিবি। সব মরদের খবর তুমি কি করে পেলে? আরও কোথাও যাতায়াত আছে নাকি? কথা বলতে বলতে হেসে উঠলো আলী।

খলিদা কোন কথা বললো না। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই গওহরের মনে হোল, খলিদা বুঝি ওর কথায় রাগ করেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো, না ওর কথায় কিছুতেই গোঁসা করতে পারে না। মা-বাপ মরা মেয়ে, নানার কাছে মানুষ। রুজি-রোজগারের পয়সায় দিন চলে। এই গরিবী অবস্থার মানুষ এরা। আলী গওহর এই খলিদা বাণুকে মানুষ করার জন্য অনেক খরচ করেছে, বিস্তর টাকা দিয়েছে খলিদার নানাকে। খলিদাও জানে সব। হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে নজরে পড়ে সে। রূপের জৌলসে মুগ্ধ হবে যে কোন জওয়ান। কিশোরী খলিদা এখন যৌবনের রংয়ে রংগীন। আলী শুনেছিল দু-একজন আমির খলিদাকে সাদী করতে চায়। প্রচুর টাকার লোভে খলিদার নানা নাকি রাজীও হয়েছিল খলিদার সাথে কলমা পড়িয়ে দেবে কিন্তু বাদ সেধেছে সে নিজে। বলেছে—নানা, আশরফির লোভে তুমি যদি আমাকে অন্য কোথাও বিক্রী করে দাও তবে সে শুধু আমার মৃত দেহই পাবে, জিন্দা আমাকে পাবে না।

হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল বৃদ্ধ, বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—নারে বাণু তোকে কোথাও যেতে দেব না। তোর মর্জ্জীর উপরে আমি কোন দিনই হুকুম করবো না। তারপর সেই সব পুরানো কথা। ওর বাবা মা'র কথা। কেমন করে জোয়ান মরদ লড়াই করতে গিয়ে মারা গেল সেই সব কাহিনী। আর খলিদা বাণু দুনিয়ার আলো দেখার সাথে সাথে মারা গেল ওর আম্মাজান। নানার কথায় খলিদা ভীষণ কাঁদে। তার বুকে মুখ লুকিয়ে বলে—না-না আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। আমাকে কোথাও পাঠিও না। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথায় তুষ্ট করে বহু কথার

পর নানা একটু হেসে বলে—তাহলে আলী গওহরকেও তুই সাদী করবি না তো?

—ধেৎ, হাসতে হাসতে ছুট দেয় খলিদা বাণু।

আলী গওহর বুঝেছে আশমানতারার হাত থেকে সে সহজে মুক্তি পাবে না। কিন্তু তাহলে তো এ জীবনে খলিদা বাণুকে কাছে পাওয়া যাবে না। কিশোরী খলিদার সুখের স্বর্গ ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে, এ করতে মন চাইছে না গওহরের। আশমান-তারাকে যদি কোথাও ভিড়িয়ে দেওয়া যায়, ওর চক্রান্তে মদৎ দেয়ার মত যদি অন্য কাউকে পাওয়া যায়—তাহলে হয়ত আশমানতারার ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

গওহর আপন মনে তামাম এলাকার মানুষগুলোর মুখ স্মরণ করতে লাগলো। কাকে কাজে লাগানো যায়, আশমানতারার যৌবনের লোভে কোন পতঙ্গকে ধরা যায়—ভাবতে লাগলো গওহর। অনেক চিন্তার শেষে মনে হোল ইকবালের কথা।

পেয়াসবাড়ির তরুণ আমীর মুজাফ্‌ফর ইকবাল। সবে আমিরী পেয়েছে. শোনা যায় গোলাবী নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে সর্ব্বক্ষণ। রাজনীতির পাঠ নিয়েছে কিছুদিন বিভিন্ন ধুরন্ধরদের কাছে। টোপ ফেললে কেমন হয়! ভাবতে থাকে আলী গওহর। মুবারকের হারেমের কোন জারিয়াকেও যদি বেগম বলে ইকবালের কাছে পাঠানো যায় তাতেই কিস্তি মাৎ, আশমানতারার তো কথাই নেই। তাছাড়া ইকবাল সুপুরুষ, বয়েসেও জোয়ান, ভালই লাগবে আশমানতারার।

কিন্তু কি ভাবে যোগাযোগ করা যায়? যদি ইকবাল বিশ্বাস না করে গওহরকে, কিংবা মুবারকের কানে তুলে দেয় কথাটা? একটা বিরাট জিজ্ঞাসার সম্মুখে দুলতে লাগলো আলী। তারপর এক সময় আপন মনে পায়চারী করতে করতে ভাবলো—দেখাই যাক্ না কি হয়। হিম্মৎ না করলে কাজ করা যায় না। মরদ হয়ে যখন পয়দা হয়েছি তখন দেখিই না কৌশিস করে। গওহর

ইকবাল-এর সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইকবাল ধীর মস্তিষ্কে আলী গওহরের সমস্ত কথা শুনে বললো—খাঁ সাহেব আপনার কথায় যে বেইমানির গন্ধ নেই, তা কি করে বুঝবো?

আলী গওহর কোমর থেকে তলোয়ার বের করে শপথ করে বললো—কসম করে বলছি, যদি আমার একটা জবান ঝুটা হয় তবে আপনি নিজ হাতে আমার গর্দ্দান নেবেন জঁাহাপনা।

—কিন্তু মীর মুবারক তার আগেই আমার গর্দ্দান নিয়ে নেবে না তো?

—জঁাহাপনা, আমার কথায় বিশ্বাস অবিশ্বাস যা খুশী আপনি করতে পারেন। আমার কিছু বলার নেই। সারা মুল্লুকে অনেক আমির উজীর আছে, কারো কাছে না পাঠিয়ে বেগম সাহেবা আপনার কাছে পাঠালো বলেই ছুটে এলাম।

—আপনি বুঝি বেগম সাহেবার খুব আপন জন?

—জী জঁাহাপনা, তিনি আমার আত্মীয়া।

—তাহলে মীর মুবারকের সর্ব্বনাশ করার বাসনায়, আপনার আত্মীয়ের নবাবকে বেকায়দায় ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন কেন, তা তো বুঝতে পারছি না?

ইকবালের কথায় হকচকিয়ে যায় আলী গওহর। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে—জঁাহাপনা, প্রজাদের উপর জুলুম, হাবেমে বিবি সাহেবাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচাব, সিপাহীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে তিনি সকলের দুশমন বনে গিয়েছেন। তাছাড়া দিন রাত সরাবীর মধ্যে ডুবে থাকলে কি নবাবের চলে?

—তাতে কি হয়েছে। আপনাদের মত বিচক্ষণ সাহসী সিপাহী সর্দ্দার থাকতে নবাবের তো চিন্তার কারণ থাকা উচিৎ নয়। তা ছাড়া আপনি যখন নবাবের সিপাহী বাহিনীর সর্দ্দার তখন তো কথাই নেই। আচ্ছা খাঁ সাহেব আর কত জন আপনার মতন বিশ্বাসভাজন লোক আছে সিপাহী দলে? ইকবালের কথায় সর্বাঙ্গে বিছুটি

পাতার মত যন্ত্রণা লাগে। গওহর ভয় পায়, কি জানি ইকবালকে বোঝা শক্ত, কথাবার্তার ধরনও ভাল নয়। আমতা আমতা করে বলে—মালিক, আপনি কি তাহলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? আমি মুসলমান, পবিত্র কোরাণের নাম উচ্চারণ করে বলতে পারি এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

স্মিত হেসে ইকবাল বলে—আমি তো তা বলিনি খাঁ সাহেব। আমি জানি আপনার কথার অর্থ স্পষ্ট। তা হচ্ছে মুবারকের সৌভাগ্যে আপনারা ঈর্ষান্বিত। তার বিরুদ্ধে আপনারা বিদ্রোহ করতে চান, আর সেই ঘটনাচক্রের নায়ক চান আমাকে। তাই না?

নিরুত্তর আলী গওহর।

ইকবাল বলে—কিন্তু খাঁ সাহেব, হারেমের পর্দ্দানসীন বিবি আশমানতারা হঠাৎ নবাবের ওপর গোঁসা কেন হলেন তা কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না। সত্যিকারের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন?

আলী গওহরের মনে দুর্ভাবনার মেঘ জমা হচ্ছিল, বিচিত্র লোক এই ইকবাল। এর কাছে এসে ফ্যাসাদে পড়তে হবে তা আগে বুঝলে এখানে আসতো কোন শা—

ইকবালের প্রশ্নে চমক ভাংলো গওহরের। বললো, হুজুর, বেগম-সাহেবার সাথে কথা বল্লেই আপনার সমস্ত জিজ্ঞাসার শেষ হবে। যদি হুকুম করেন তো বেগম সাহেবার সাথে আপনার মুলাকাতের ব্যবস্থা করতে পারি।

—তাই নাকি, তা বেশ, তা বেশ। তাহলে তো দেখছি সিপাহী সর্দ্দার শুধু দৌত্যের কাজই করতে পারদর্শী নন, প্রয়োজনে বেগম সাহেবাকেও হারেম থেকে ইলোপ করতে সক্ষম, কি বলেন?

রাগে গওহরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলে—হুজুর, বেয়াদফি মাপ করবেন, আমি চল্লাম।

ইকবাল উঠে দাঁড়ায়, পায়ে পায়ে গওহরের কাছে এসে হাত ধরে বলে—কেন গোঁসা করছেন সর্দ্দার। আমাকে যখন এতটাই বিশ্বাস করেছেন, তাহলে শুধু এইটুকুই শুনে রাখুন আপনাদের

ইচ্ছাপূরণ হবে কিন্তু হ্যাঁ, তার আগে আমি নিভৃতে আশমানতারার সাথে কিছু বাৎচিৎ করতে চাই।

ধাতস্থ হয় আলী গওহর।

ইকবালের ইংগিতে সুরা আসতেই আপত্তি করে গওহর। আমীর ইকবাল হেসে উঠে সশব্দে সরাবে চুমুক দিয়ে বলে—খাঁ সাহেব সরাবীকে আপনার এত ঘৃণা কেন!

—আমিও তো আপনাদের নবাবের মত সারাদিন সরাবী পিয়ে থাকি। কিন্তু তা বলে কি আমার দায়িত্ব পালনে আমি অক্ষম? আমার বিবিরা কি কোন সিপাহী সর্দ্দারের সাথে বাইরে উড়ে যেতে চায়? নেহি, কভি নেহি। সেরা আওরত, সুরুজকা আলা নেহি দেখা, অউর কভিভি নেহি দেখনে পায়গী।

ইকবাল আলী গওহরের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। সুযোগ নেয় গওহর। বলে, জাঁহাপনা, আপনার মত জওয়ানী উমর যার, তার আবার চিন্তা কিসের। আপনার দিল আছে, হিম্মৎ আছে, আপনি কেন আশমানতারাকে নিজের বেগম বানাবেন না হুজুর। এই তো সুযোগ।

—এই তো সুযোগ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঠিক বলেছ সর্দ্দার। এই তো সুযোগ, আশমানতারাকে আমার চাই।

ইকবাল মুহূর্তে একটা আংটি খুলে গওহরকে দিয়ে বলে—যাও সর্দ্দার, এটা আমার নিশানা, বেগম আশমানতারাকে দিয়ে দিও। আর তোমার জন্য রইলো এই মোহর। আর যদি আশমানতাবাকে আমার কাছে পৌছে দিতে পার তবে তোমাকে আরও বহুত ইনাম দিব, জবান দিলাম।

আলী গওহর হতচকিত হয়ে ইকবালের দিকে তাকাতেই গর্জ্জে ওঠে সে, কেয়া ছাখ্‌তা বেয়াকুফ্‌, যাও অভি চলা যাও হিঁয়াসে। আশমানতারাকো মেরে পাশ লে আও, ম্যঁয় উসকো দেখ্‌নে চাহ্‌তা।

ইকবাল টলছে। দু'পায়ে ভর দিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়াতে

পারছে না। গওহরের ইংগিতে ইকবালের পার্শ্বচরেরা বিশ্রামের জন্য জোর করে নিয়ে গেল ওকে। গওহর আংটি ও মোহরগুলো সন্তর্পণে নিজের কোমরে রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলো, ইকবাল প্রলাপ বকছে। মুঁঝে আশমানতারাকো চাহিয়ে। গওহর ভয় পেলো, কি জানি মাতালের পাল্লায় পড়ে প্রাণহানি না ঘটে।

বাদশাহী তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সরাবীতে ঠোঁট ভেজাচ্ছিল নবাব শাহানশা মুবারক, ঘুঙুরের শব্দে মুখ তুলে দেখলো গুলাবীকে। খুশীতে ঝলমল করে উঠলো নবাবের মন। হাত বাড়িয়ে বললো—এসো পেয়ারী, আমার মোহব্বতের গুলাব, আও মেরে পাশ।

গুলাবী নবাবের কোল ঘেঁসে বসলো। নেশার আমেজে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল মুবারকের। কিন্তু গোলাবী কাছে আসতেই অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে। বাঃ! তোফা লাগছে বিবিকে।

সোনা রং জরিদার পাড় বসানো ঘাঘরা, কাঁচুলীতে নীল মেঘের ঝড়। লাল রেশমী সালোয়ারে চমকদার মতি। দু'পায়ে ঘুঙুর। অপূর্ব্ব লাগছে ওকে। সারা জাঁহানের রূপ ওর দেহে বাঁধা পড়েছে। অভিভূত মুবারক সবলে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো গুলাবীকে, দু'ঠোঁটের চাপে সারা মুখ লাল হয়ে উঠলো। চঞ্চল হরিণী ঝটপট করে উঠলো কামনায়, আরো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরলো নবাবকে।

একটা গুলিবিদ্ধ হিংস্র বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো হরিণ শিশুর ওপর দুরন্তগতিতে।

গুলাবী উঠে দাঁড়িয়ে অবিন্যস্ত পোষাক ঠিক করতে করতে বললো—জাঁহাপনা, আপনি সেদিন নাচ দেখতে চেয়েছিলেন, গান শুনতে চেয়েছিলেন, আজ দেখবেন?

সোহাগে আদুরে গলায় নবাবকে বলতেই খুশীতে বলে উঠলো মুবারক,—জরুর বেগম, বহুত আচ্ছাসে নাচো, গাও, হমভি তুমারে

সাথ হ্যায়। কথা টেনে টেনে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো মুবারক।

সুরেলা কণ্ঠে গানের কলিতে টান দিল গুলাবী। কিন্তু শুনবে গান। মুবারকের দু'চোখে তখন সারা রাজ্যের ঘুম। নেশা চুর হয়ে মুবারক দু'একবার আধো আধো স্বরে কি যেন বলা চাইলো, পারলো না। তাকিয়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো হাত-প ছড়িয়ে।

গুলাবী অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো মুবারককে। নবা শাহানশা মুবারক শিশুর মত ঘুমোচ্ছে ওর ঘরে। সারল্যের ছা সারা মুখে। সামান্য সিপাহী, শঠতা আর চক্রান্তকে পুঁজি কা ভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে। এই সেই মুবারক! কি গভী বিশ্বাস করেছে গুলাবীকে। মাত্র অল্প দিন হল গুলাবী এসে এখানে। যৌবন ওর পুঁজি, একে সম্বল করেই বাঁচতে হবে তাকে সময় থাকতে ভাগ্যকে গুছিয়ে না নিলে মরীয়ম বেগমের মত আল্ল কাছে দোয়া প্রার্থনা করে যেতে হবে শুধু সারাজীবন ধরে। কো ফল মিলবে না।

গুলাবী মুবারকের মাথার কাছে বসে নিজের কোলে নবাবে মাথা তুলে নিয়ে চুলে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবলো—এই সে নবাব, এখন সংজ্ঞাহীন। স্বচ্ছন্দে জীবনহানি করতে পারে তাঁ কিন্তু কি লাভ।

ভয়ঙ্কর এই মানুষটা তামাম মুল্লুকে ত্রাসের সঞ্চার করেছে দুশমনরা মুবারকের নামে হাত থেকে তরবারি নামিয়ে দিয়েছে মাতা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে পুত্রের প্রা ভিক্ষা করেছে। তরুণী বধূ স্বামীর জীবন ভিক্ষায় নিজের ইজ্জতে লুটিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু দয়াহীন, মায়াহীন, রক্তপিপা মুবারক জ্বলন্ত অঙ্গারের মত মানুষের জীবনকে খাঁক করে দিয়েছে অগণিত মানুষ খতম করেছে দুনিয়া থেকে। গুলাবীর মনে কেম একটা ইচ্ছা ছটফট করতে লাগলো, কি করবে সে? পালিয়ে যা এই দুর্দ্ধর্ষ নবাবের হারেম থেকে, না তাকে ভালবাসায় ভরে তুলবে

ছুই ঠিক করতে পারলো না গুলাবী। অবাক বিস্ময়ে মুবারকের খের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় তাকে বুকে জড়িয়ে রে পাগলের মত চুম্বন এঁকে দিতে লাগলো সারা কপালে। ারপর ঘুমিয়ে পড়লো এক সময়ে।

মুবারক চোখ মেলে দেখলো, সারা ঘরে আলোর রোশনাই। ার বুকে অকাতরে ঘুমাচ্ছে গুলাবী বাঈ পরম নিশ্চিন্তে। গভীর রিতৃপ্তির ছাপ ওর মুখে চোখে। মুবারকের খুব ভাল লাগলো ই মুহূর্ত। দু'চোখ বন্ধ করে গত রাতের কথা ভাবতে ভাবতে াবেশে গুলাবীর কাজল কালো চুলে মুখ ডুবিয়ে আদর করে ডাক ালো—এ্যাই বেগম, বেগম।

—উঁ।

—সবেরা হয়েছে বেগম। ওঠো। উঠবে না?

—হুঁ, গুলাবী আরো জোর করে জড়িয়ে ধরলো নবাবকে।

মুবারক গুলাবীর হাত ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসতেই গুলাবী িল খিল করে হেসে উঠে বসলো। তারপর এক লহমায় অবিনস্ত ল জড়ো করে বেঁধে বললো—শাহান'শা কাল রাত্তিরে গান কেমন নলেন?

—বেগম, রসিকতা করছ! কি করবো বল, সিরাজীটা জমেছিল াল। বহুকাল পর এই প্রথম নির্ভয়ে একটু ঘুমালাম লাবী।

—কেন জাঁহাপনা, আপনার কি রাতে ভাল নিদ্ হয় না?

মাথা নাড়ে মুবারক।—না, জানো বিবি, সব সময় মাথার পর তলোয়ার ঝুলছে। চারদিকে দুশমনেরা ফিস্‌ফাস্ করে ইমানির চেষ্টা করছে! এর মাঝে কি নিদ্ আসে বেগম? আসে । তুমি তো একদিন বলেছিলে, হারেমের সব্বাই বেইমান, ামার মনে হয় তামাম দুনিয়াটা বেইমান। আর সমস্ত মানুষেরা মন।

—আমিও জাঁহাপনা?

—না, বেগম, তুমি আমার জান, আমার মোহব্বতের হুরী আবেশে বুকে জড়িয়ে নিষ্পেষিত করতে লাগলো মুবারক গুলাব বাঈকে।

খলিদা বাণুর সাথে দেখা করতে যাবার উপক্রম করতেই ইকবালের চর আলী গওহরকে সেলাম জানালো। বহুত জরুরী দরকার, আজ রাত্তিরেই দেখা করতে হবে। বিরক্তিতে কুঁচকে গেল গওহরের মন। এমন মিষ্টি মধুর রাত্তিরটা বানচাল করে দিল বেটাচ্ছেলে, কিন্তু উপায় কি! গেরো যখন পাকিয়েছে তখন তার জট না খুলে তো উপায় নেই।

কথা আদায় করে সেলাম ঠুকে চর বেরিয়ে যেতেই আলী গওহরের মুখ থেকে একটা অশ্রাব্য গালাগাল বেরিয়ে এল, তারপর আবার প্রেমের পোষাক পাল্টে অন্য বেশে রওনা হোল ইকবালের মহলে। সেদিনের ভীতি আজো গওহরের মন থেকে মুছে যায়নি, দুর্ভাবনায় বাইরের ঘরে বসে আছে গওহর, কি জানি আবার যদি সেই মত্ত অবস্থায় আশমানতারা—আশমানতারা করতে করতে বেবিয়ে আসে তবেই কেলেঙ্কারী।

ছোকরা অল্প দিন যাবৎ আমিরী পেয়েছে, বয়সও কাঁচা কিন্তু এর মধ্যেই বেশ সরেস পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে দেখছি। বিরক্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে করতে অনেক কথাই মনে এল গওহরের। আমীর হওয়ার স্বপ্ন তার মনেও জাগে কিন্তু ইকবালের মত আমীর দেখে ঘেন্না আসে তার। ছোকরা সুরা আর নারী নিয়েই অষ্ট প্রহর মাতোয়ারা, ওর আনন্দের রসদ জোগাড় হয় গরীব দুস্থ প্রজাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থে-ফসলে। এ ছাড়া পথই বা কোথায়! আনমনে কি ভাবছিল গওহর তা নিজেরই খেয়াল ছিল না, হঠাৎ একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর গওহরের মন থেকে তামাম চিন্তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

নবাবী পোষাকে নিজেকে সাজিয়েছে ইকবাল। সারা দেহে বিলাসের বস্ত্র। ইকবাল দরওয়াজার কাছ থেকে ডাক দিল—সর্দ্দার, কেমন আছ ভাল!

—জী হুজুর, কুর্নিশ জানাল সিপাহী সর্দ্দার আলী গওহর।

ইকবালের ইংগিতে সবাই সরে যেতে গওহরের খুব কাছে গিয়ে বসলো সে, বললো—সেদিনের ব্যাপারে তুমি খুব গোঁসা করেছিলে, তাই না সর্দ্দার! কিন্তু কি করবো বল, ও রকম যে হবে তা আমি নিজেই বুঝতে পারিনি।

—না, না, আমি কিছু ভাবিনি আমীর সাহেব। সঙ্কোচে ছোট হয়ে আসে সর্দ্দার গওহর। তারপর দীর্ঘ একটানা কথা চলে, চুক্তি সম্পন্ন হয় কসমের মধ্য দিয়ে। আমীর-ই-ইকবাল সর্দ্দারকে দোস্তরূপে গণ্য করে বুকে জড়িয়ে ধরে।

স্থির হয় আলী গওহর হাজার আশরফির বদলে তুলে দেবে আশমানতারাকে ইকবালের নিজ মহলে। পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও তাঁর, আগাম বায়নাও কিছু মিলেছে আলী গওহরের। যদি মুবারকের সাথে সংগ্রাম বাধে তবে সেদিন সিপাহী সর্দ্দার নিজেও মুবারকের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে দ্বিধা করবে না।

খুশী হয় ইকবাল। মুবারক যখন জানবে তার হারেমের বিবি ইকবালের হারেমে, তখন তার মুখাবয়ব কি রকম হবে সে কথা ভাবতেই খুশীতে মজবুর হয়ে ওঠে ইকবাল। ক্ষুদ্র সিপাহী আজ তাদের ওপর লাঠি ঘোরাচ্ছে, খবরদারী করছে, এ অসহ্য—অসহ্য—।

প্রতিশোধের তৃপ্তি কল্পনায় সারা ঘরময় পায়চারী করে ইকবাল, তারপর এক সময় স্থির হয়ে বসে থাকা আলী গওহরের দিকে তাকিয়ে বলে—সর্দ্দার, তুমি আমার এলাকায় যেখানে পসন্দ সেইখানে থাকতে পার, আমি তোমাকে জবান দিচ্ছি সর্দ্দার, তুমি ইকবালের উপযুক্ত দোস্ত হয়েই এখানে থাকবে।

বুক ঢিপ ঢিপ করছে আলী গওহরের। তবু ইকবালের কথায়

ঘাড় নেড়ে আশরফির থলি নিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

বেগম মরীয়মের কান্নায় খোদাতালার করুণা হয়নি, মীর মুবারকের সুমতিও ফেরেনি। বরং আরো লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে নবাব মহলে। জারিযারা যেখানে যেটুকু ঘটেছে, তাকে ফলাও করে বেগম সাহেবার কাছে এসে লাগিয়েছে। বেগম সাহেবাকে তারা ভালবাসে। বেগম মহলে এই একটি মাত্র বিবি যাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, পেয়ার করে, বেগম মরীয়ম জানে এ কথা। সবার সাথেই তার মধুর ব্যবহার, আশমানতারার আচার আচরণ সম্পর্কেও তার কানে কিছু ভেসে আসে কিন্তু ওর নামও তিনি করেন না, বলেন—তোরা ওর নাম করিস না, ও তামাম হারেমের পাপ—শুভ বুদ্ধির দুশমন!

জারিয়ার কাছ থেকে আশমানতারাও শুনেছে একথা, বলেছে ব্যঙ্গ করে—বেগম সাহেবার বুঝি নবাব দর্শন না পেয়ে মাথাটা একেবারেই বিগড়ে গেছে! যা-না তোরা সবাই মিলে নবাব সোহাগীকে নবাবের কাছে ধরে নিয়ে যা। দেখছিস না দিন রাত কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে।

আশমানতারা কাউকে কিছু বলতে পারলে খুশী হয়, যেন নিজ শরীর থেকে খানিকটা বিষ ঢেলে আশ্বস্ত হয় সে।

বেগম মরীয়মের আগে আগে কষ্ট হতো এ সব কথা শুনে, আজকাল আর গুরুত্ব দেয় না এসব ছেঁদো কথায়। বরংচ জারিয়াদের বলে—থাক্‌গে ওর কথায় তোরা কান দিসনা, শোকে-দুখে বেচারীর মাথাটা একদম বিগ্‌ড়ে গেছে, ওর যা ইচ্ছে বলুক—বলতে দে ওকে।

বেগম মরীয়ম জানে, হারেমের সমস্ত নারীরাও যদি নবাব কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়, তার জীবনে তা কখনই হবে না—ধর্মপ্রাণা নারী এখনো

খোদাকে বিশ্বাস করে, আর কেউ স্বীকৃতি না দেয় না দিক কিন্তু মুবারক তো জানে বেগম মরীয়মই তার প্রথম বেগম।

অনেক আশা নিয়ে বেগম মরীয়ম স্বপ্ন দেখে, মুবারক মহান নবাব হবে, হিংসা-অত্যাচার করবে না—প্রজাপীড়ন করবে না, তার সুযশে তামাম এলাকার মানুষ খুশীতে ভরে উঠবে, কিন্তু এসব আশ স্বপ্নের কথা, আবেগের বশে ভাবলেও মরীয়ম বুঝেছে এ জীবনে আর সুখ নেই। নবাবের সুমতি হবে না—হিংসা পাপেরও শেষ হবে না। মরীয়ম শেষ বারের মত জ্বলে উঠতে চাইল, দেখতে চাইল ভালবেসে যাকে পাওয়া যায় না, স্নেহ প্রেম নিয়ে যার শোধন হয়না, ঘৃণা দিয়ে, নিষ্ঠুরতা দিয়ে তাকে পাওয়া যায় কিনা? অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব মরীয়মের মনকে আন্দোলিত করতে লাগলো, ভয় হতাশা ঘিরে ধরলো, তবু যেন এই শান্ত স্নিগ্ধ রমণী চরিত্রবিরোধী কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারল না পুরোপুরিভাবে।

যে বেগম মরীয়ম গুলাবীর নাম শুনলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করতো, রাতের অন্ধকারে সে চুপি চুপি কালো বোরখায় নিজেকে আড়াল করে জারিয়া, খোজা, বান্দাদের চোখ এড়িয়ে দরজায় শব্দ করলো আস্তে আস্তে।

ভেতরে উৎকীর্ণ হোল গুলাবী। কে শব্দ করছে, জাঁহাপনা তো এখন রাজ্যের বাইরে, কোন জারিয়া তো এ সময় শব্দ করতে সাহস পাবে না, তবে কি নবাব ফিরে এল! গুলাবী আপন খেয়ালে নিজেকে সাজাচ্ছিল বসে বসে। সবুজ মখমলের কাঁচুলী জড়িয়ে ধরেছে উদ্ধত স্তনযুগলকে, নিম্নাঙ্গে ময়ূরী রংয়ের চুম্‌কী বসানো ঘাঘরা। মেঘনীল ওড়নার ঢাকনায় বক্ষ। দু'পায়ে মুজরোর ঘুংঘট। চোখের গভীরে কাজল কালি। পায়ের নখে মেহেদির রং, সারা বিকেল জারিয়া আয়েসা মেহেন্দি মাখিয়েছে বেগম সাহেবাকে, বলেছে—বিবি সাহেবা আপনার পায়ে মেহেন্দি খোলে ভাল, শুধু খুপসুরৎ বিবিদেরই মেহেন্দি ভাল লাগে তা কিন্তু নয় বেগম সাহেবা, সুখমে মেহেন্দি—দুখমে দিনাই। বেগম সাহেবা তোমার রূপে

আশমানের চাঁদ ভি শরম পায়। কথাটা মনে হতেই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো গুলাবী বাঈ-এর, দরজায় আবার শব্দ।

ভয় ও বিস্ময়ে যুগপৎ চিন্তায় উঠে দাঁড়াল গুলাবী। আশমান-তারার ঘর ভেবে অন্য কেউ এসে হাজির হোল না তো আবার! হারেমের সমস্ত রন্ধ্রপথ আশমানতারার লোকদের নখদর্পণে। আবার পরক্ষণে মনে হোল হয়তো বা কোন জারিয়া বিশেষ কোন সংবাদ এনে থাকবে, কিছু ঠিক করতে পারছে না গুলাবী। অনেক ভেবে দেরাজ থেকে একটা ছুরি বের করে এক হাতে উঁচিয়ে ধরে অতি সন্তর্পণে দরওয়াজা ফাঁক করে দেখলো বোরখা পরিহিতা কে যেন দাঁড়িয়ে—সম্ভবতঃ নারী। ভীত কণ্ঠে শুধালো—কে? কে ওখানে?

বোরখার মুখ উত্তোলিত হোল। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো গুলাবী বাঈ, হঠাৎ অবচেতন মনে দিশেহারা হয়ে বলে উঠলো—সেলাম বেগম সাহেবা।

এই প্রথম গুলাবী বাঈ একজন নারীকে সেলাম জানাল।

বেগম মরীয়ম সেলামের প্রত্যুত্তর জানিয়ে আপনা হতেই ঘরের ভেতর ঢুকে ইসারায় দরওয়াজা বন্ধ করার ইংগিত করতেই গুলাবী বাঈ দরওয়াজা বন্ধ করে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

এতক্ষণে হুঁশ এলো গুলাবীর। তাই তো কি করছে সে, হারেমের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী হয়ে সে কিনা মরীয়মের মত বাঁদীকে সেলাম জানালো! পরক্ষণেই মনে হোল হারেমের সমস্ত জারিয়া, বাঁদী, খোজা বান্দারা মরীয়মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেন—কি জন্যে! বোকাদের হাতে কিছু পয়সা ছাড়লে অতি সহজেই বুঝি প্রশংসা পাওয়া যায়! গুলাবীর কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব কাটলো বেগম মরীয়মের ডাকে।

—শোন, তোমার সাথে আমার কিছু সল্লা আছে, তাই নিজে থেকেই এসেছি তোমার কাছে—কি গোঁসা হয়নি তো?

থতমত খেলো গোলাবী বাঈ, বললো—না, না গোঁসা হবে কেন, বলুন কি বলতে চান!

আরো ঘনিষ্ঠ হতে চাইলো মরীয়ম, খুব ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলো সত্যি এরকম রূপ এর আগে সে কোথাও দেখেনি, পুরুষের মনে আগুন ধরায় বুঝি এই রূপেই। মরীয়ম বুঝলো কেন গুলাবী বাঈ এত সহজে নবাবের মন জয় করেছে। সহসা মরীয়ম গুলাবীর মেহেন্দি মাথা হাত দু'টো ধরে বললো—দ্যাখ্ অনেক ভেবে তোর কাছেই এলাম, তুই-ই পারবি এর একটা ব্যবস্থা করতে।

চুপ করে আছে গুলাবী। হারেমে কাউকে বিশ্বাস নেই, কি জানি এ আবার কোন চক্রান্ত করে ঘরে এসেছে, পরে হয় তো সুযোগ মত ছোবল মারতে কসুর করবে না। ধীর কণ্ঠে গুলাবী বলে—বলুন্না কি ব্যাপার ?

—তুই শুনিসনি ? আশমান আজকাল বাইরের লোক নিয়ে কারবার করছে, রাত-বিরেতে বাইরে যাচ্ছে। ফিস্‌ফিসিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললো মরীয়ম। গুলাবী বুঝলো আশমানতারার কথাটা তাহলে পাঁচ কানেই ছড়িয়েছে, ভেবেছিল ও নিজে ছাড়া বুঝি আর কেউ জানে না। অবাক হওয়ার ভান করে আকাশ থেকে পড়ল গুলাবী।

—সে কি, এ কথা কি সত্যি ?

—হ্যারে, শুধু কি তাই, নবাবকে বিপদে ফেলার চক্রান্ত করছে পর্যন্ত, আর সে জন্মেই তো তোর কাছে আসা।

—কি রকম !

—কথাটা নবাবের কানে তুলে দে। হারেমের ইজ্জত ধূলায় লুটিয়ে দিল মাগী, তাছাড়া নবাবের বিপদে যদি আমরা না দেখি তবে কে দেখবে বল ?

—এ কথা তো নবাবের কাছে আপনিও বলতে পারেন।

—আমার সাথে কি আর দেখা হয়রে। শুনেছি তুই হুজুরকে বুদ্ধি জোগাচ্ছিস্ তাকে তুক করেছিস, তাই তো তিনি দু'বেলা তোর ঘরে আসেন আর সে জন্মেই তোকে বলা।

—একথা যদি নবাব বিশ্বাস না করেন, যদি আমাকে শাস্তি দেন, তবে কি হবে!

—না, না তোকে শাস্তি দিতেই পারেন না, তুই এখন নবাবের জান, তাছাড়া সন্দেহের কি আছে, এক হপ্তা গোপনে নজর রাখলেই তো ব্যাপারটা ধরা পড়বে।

—কি দরকার এসব করে, বলতে পারেন হারেমে এমন কেউ কি আছে যে পরপুরুষের লিপ্সা করে না? সুযোগ পেলেই দু'দণ্ড পুরুষের গায়ের গন্ধ চায় না!

অবাক হল মরীয়ম, বলে কি মেয়েটা, নিজের মত করেই বুঝি সবাইকে ভাবে।

—কি বলছিস তুই গুলাবী, হারেমের তামাম মানুষগুলিকে তুই এক রকম ভাবিস?

কথা বলতে বলতে দুচোখে পানি নেমে এল মরীয়ম বিবির, ধরা গলায় বললো—বিশ্বাস কর, পরপুরুষ তো দূরের কথা, খোদাহতালার নাম না করে দাঁতে দানা পর্যন্ত আমি কাটিনা, খোদার কাছে নবাবের জন্য দোয়া কামনা না করা পর্যন্ত মুখে পানি নেই না, আর তুই কি না সব্বাইকে আশমানের মত ভাবলি?

হতভম্ব হোল গুলাবী বাঈ। পতিপ্রাণা অতি সাধারণ চিন্তার নারী—সে কোন দিন স্বামীর দোষ দেখেনা, অবজ্ঞার পরিবর্তে ভালবাসা দিয়ে যায় সমগ্র জীবন। গুলাবীর মনে যেন কেমন একটা নারী হৃদয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, নিজের প্রতি রাগ হোল, তাই তো কি করেছে সে এতদিন! সারাটা জীবন কচুরী পানার মত ভেসে চলেছে এখান থেকে সেখানে।

যতদিন যৌবন ততদিন তাঁর এই অভিসারের যাত্রা। ততদিন প্রভাব; কিন্তু যাত্রারও তো শেষ আছে! কি অধিকার আছে তার এই সাধ্বী রমণীর ভাগ্যে কালো মেঘ বিস্তারের, স্বামীর আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত করার!

গুলাবীকে চুপ করে থাকতে দেখে মরীয়ম আরো শক্ত করে

তার হাতদুটোকে নিজের হাতে চেপে ধরে বললো—কিরে, কথা বলিসনা কেন? নবাবের এই বিপদের দিনে তুই কি এটা করতে পারবি না, তাকে হুঁশিয়ার করে দিবিনা?

—দেবো বেগম সাহেবা, আপনার সমস্ত কথা আমি নবাব-সাহেবের কাছে তুলে ধরবো। গুলাবী আর কথা বলতে পাবল না, বুক ফাটা কান্না যেন ঝড় তুলছে তার মনের সমুদ্রে।

মরীয়ম উঠে দাঁড়াল। আনন্দে গুলাবীর পিঠে হাত বুলিয়ে সোহাগ করে বললো—তুই সুখী হ গুলাবী, তুই নবাবের পেয়ারী হয়ে থাক।

বেগম মরীয়ম ঘর থেকে যাবার সাথে সাথে কান্নায় বিছানায় ভেঙ্গে পড়লো গুলাবী। জীবনে সে কাউকে নিবিড় করে আপন করে ভালবাসতে পারলো না কেন? কোন কোন পুরুষের জন্য সে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেলনা, মরীয়মের মত আকুল হয়ে রাতের অন্ধকারে স্বামীর কল্যাণের জন্য বেগম হয়ে একটা নগণ্য ঘৃণ্য বাঈজীর কাছে নিজেকে ছোট করতে দ্বিধা করলো না। কিন্তু সেতো কিছুই পায়নি। শুধু সারাজীবন স্বপ্নের গালিচায় শুয়ে শুয়ে খোয়াব দেখেছে, আর মরীয়ম? মরীয়ম স্বামীকে ভালবেসেছে তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়ে, স্বামীর অনাদর, ঘৃণা অবজ্ঞাতেও সে স্বামীকে হৃদয় থেকে সরাতে পারেনি, কিন্তু গুলাবী! কি আছে তার, যৌবন কুসুম শুকিয়ে গেলে তখন কেউ তো ফিরে তাকাবে না। বিছানায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো বেগম গুলাবী বাঈ।

আলী রেজার ফকিরী জীবন কাটলো বহুকাল। যাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তামাম জিন্দগী নিজেকে দরবেশ বলে আত্মগোপন করে রইলো, শেষে কিনা তারই চোখের সামনে সিপাহী সর্দ্দার আলী গওহর আশমানতারার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, মজা লুটবে!

আলী রেজা পথশ্রমে ক্লান্ত। আশমানতারার হুকুম সে অম্লান

বদনে মেনে নিয়ে পথে বেরিয়েছে কিন্তু আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়। রৌদ্রের দাবদাহে পা ফেটে খুন ঝরছে, প্রজারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না, কেউ বা মুবারকের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে ভয়ে দরওয়াজা ইস্তক বন্ধ করে দিচ্ছে। কি করবে ঠাহর করতে পারছে না আলী রেজা। আশমান বলেছিল তামাম মুল্লুকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে, কিন্তু কি করে!

অতীত জীবনকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তার মন অস্থির হয়ে উঠেছে কিন্তু কোথায় ঠাঁই আছে তার, শুধু মহজিদ আর মহজিদ। চোখের সামনে আলী গওহর আশমানকে নিয়ে ফূর্তি করবে কিন্তু কিছু বলা যাবে না, কারণ আশমানতারাকে নিয়ে সে নিজে যা করেছিল তা যদি গওহর জানতে পারতো তবে হয়ত এদ্দিনে দুনিয়ার আলো আর দেখতে হতোনা তাকে, তা বলেতো আলী গওহরের হাতে আশমানতারাকে তুলে দেওয়া যায় না। চোখের সামনে এই সব দেখবে সে! রাগে অস্বস্তিতে মাথা গরম হয়ে উঠলো আলী রেজার।

নাঃ আর নয়, এবারে ফেরার পালা।

দরবেশের ঝুলি নিয়ে অনেক বৎসর কেটেছে তার, এবার ঝুলি খোলার পালা। আলী রেজা ভাবলো কথাটা যদি মুবারকের কানে যায় তাহলে হয়ত তার নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে, তা যদি হয় তবে তাই হোক।

ধীরে ধীরে মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করার চাইতে একবারে জানে খতম অনেক ভাল। আলী রেজা ঠিক করলো এই ফকিরী বেশেই সে মুবারকের সাথে দেখা করবে, যদিও মুবারক কাউকে বিশ্বাস করে না, তবু খোদার মর্জ্জি হলে হয়তো বা বিশ্বাস করতেও পারে।

দরবেশ যাত্রা পথে মুখ ফেরাল। এখন মুবারকই তার লক্ষ্য বস্তু, তারপর দেখা যাক কোথাকার পানি কোন দিকে ছোটে।

খলিদা বানুর নানার আর তর সইছিল না। চারদিকে লোভাতুর শেয়ালরা সব সময় উঁকি-ঝুঁকি মারছে, কি দরকার জোয়ান মেয়েকে ঘরে রাখবার। ভেবেছিল খলিদাকে সাদী দিয়ে কিছু ভালই মিলবে কিন্তু বেয়াড়া মেয়ে ওর পছন্দ মতই সাদী করবে। এখন যার জিনিষ তার হাতে তুলে দিলেই নিশ্চিন্তি।

বৃদ্ধ আলী গওহরকে সব কথা বোঝাল, এমন কি এ ব্যাপারে আবার যদি কোন ঝামেলা হয় তাহলে এই বুড়ো বয়েসে এত ঝক্কিই বা সে সইবে কেমন করে! দেহে তাগৎ নেই বোঝা বইবার, তার ওপর আবার এই আগুনের ফুলকে সামলানো।

গওহর আর আপত্তি করলো না।

সামনে একটা বিরাট ভাগ্য পরীক্ষা, যা হয় একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে, তার চেয়ে সাদীটা করে নেয়াই ভাল।

বৃদ্ধের পাশ কাটিয়ে অন্দর মহলে এগোল গওহর, ওকে দেখে খলিদা ঝাঝিয়ে উঠলো আজকে, বললো—কি মিঞা সাহেব, তুমি নাকি আমাকে সাদী করতে ভয় পাও, আজ না কাল করে করে নাকি তারিখ পেছাচ্ছ, সত্যি নাকি?

—কই নাতো! ঢোক গিললো গওহর, ইচ্ছে হোল তামাম ঘটনাগুলো ওকে বলে, কিন্তু মেয়েছেলের কাছে এই মুহূর্তে সব ফাঁস করলে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ!

খলিদা গওহরের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে বললো।

—কি হয়েছে তোমার খাঁ সাহেব, একটু খোলসা করে বল না—নাকি আমাকে বিশ্বাস করতে ভয় হয়!

পাতলা ঠোঁটে দুষ্টু হাসির দিকে তাকিয়ে গওহর বললো।

—বিবি ভয়ের সাথে আমার পরিচয় নেই, আর বিশ্বাসের কথা বলছ? সে আমি তোমাকে করি, কিন্তু এখনো বলার সময় আসেনি বানু, সময়ে ঠিকই বলবো।

গুলাবী ভাবছিল কি করে কথাটা নবাবের কানে দেয়া যায়? হয়ত নবাব ভাবতে পারেন ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই এ কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু একথা বলতে তাকে হবেই।

দৌলতনগরের বিদ্রোহ দমন করে সবে ফিরে এসেছেন নবাব। বিশ্রামের সময় মেলেনি। এবারও গৌড় বাদশা আলীমর্দ্দান দরবারে ঘোষণা করেছে মীর মুবারকের যুদ্ধের কৃতিত্ব। প্রশংসা করেসেমস্ত ওমরাহ বৃন্দছ।

গৌড় থেকে ফিরেই নবাব গুলাবী বাঈ-এর ঘরে এসেছেন যথারীতি। গুলাবী জানতো নবাব আসবেন তাই আগে থেকেই সাজিয়েছে নিজের মহলকে। নিজেকেও সাজিয়েছে দারুণ করে, চোখে টেনেছে সুরমা, দেহে জড়িয়েছে পাতলা মোলায়েম বসন, উঁকি দিচ্ছে যৌবন, কটি দেশের ভঙ্গিমায় অবাক হয়ে আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরেছেন সম্রাট, আদরে আদরে নিষ্পেষ্ট করে বলেছেন—গুলাবী কি অপরূপ সুন্দর তুমি, খোদা তোমাকে সারা জাহানের রূপ দিয়েছেন, যখন যেখানে থাকি সব সময় কঠোর যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তোমার কথা বার বার মনে হয়, তুমি আমাকে পাগল করেছ বেগম!

—জাঁহাপনা, আপনি ক্লান্ত, আজ বিশ্রাম করুন।

তোমার কাছে এসেছি এই তো আমার বিশ্রাম, বল বেগম তোমার মহলের কি কি খবর আমাকে শোনাবে বল!

—জী জাঁহাপনা, শোনাব, কিন্তু আজ নয় কাল।

—কেন বেগম আজ নয় কেন?

—না জাঁহাপনা, আজ নয় কাল।

কিন্তু পরদিনও শোনা হোল না নবাবের। সকালের আলো ফুটতে না ফুটতে নবাব আলামর্দ্দানের এত্তেলা এসে হাজির, গোপন পরামর্শের জন্য জরুরী তলব।

মীর মুবারকের অনুপস্থিতির চরম সুযোগ নিল আলী গওহর, সেই নির্দ্দিষ্ট রন্ধ্র পথে আশমানতারার সাথে দেখা করে পালাতে চাইলো ইকবালের কাছে, কিন্তু বেঁকে বসলো আশমানতারা।

—না, আমি তো পালাতে চাইছি। আমি মুবারককে সরাতে চেয়েছি, সে জায়গায় তোমাকে বসাতে চেয়েছি, হারেমখানার দাবী তো ছাড়তে চাইনি।

হতভম্ব আলী গওহর, ভেবেছিল খুব সহজে কাজ হাসিল করবে, কিন্তু শেষ পযন্ত সব আশা ফস্কে যায় দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলো গওহর, কি জানি ইকবাল যে ধরনের লোক, হয়ত ঠিক মত কাজ করতে না পারলে জান নিতেও কসুর করবে না। কারণ, আশরফি-গুলো তো আর ফিরিয়ে দেয়া যায় না। ভয়ে ঘেমে উঠলো গওহর। কয়েকদিন ভাববার সময় নিয়ে আশমানতারার ঘর থেকে সন্তর্পণে ছিটকে বেরিয়ে এল সে, কিন্তু ভয় তাকে সর্বক্ষণ তাড়া করতে লাগলো। গওহর খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে চাইলো। ভাবলো মীর মুবারক গৌড় থেকে ফিরে আসার সাথে সাথে তাকে জানাতে হবে ইকবালের ঔদ্ধত্যের কথা—আশমানতারার অনাচারের কথা, দরকার হলে কিছু আশরফি মুবারকের পায়ে জমা দিয়ে জানাতে হবে সংবাদটা, কিন্তু মনে ভরসা পেলনা গওহর, নবাব যদি উগ্রমূর্ত্তি হয়ে প্রমাণ চায়, আশমানতারার কাছে ধরে নিয়ে যায় তবে ঘাড় থেকে ধড় খুলে নিতে বিলম্ব করবে না মুবারক। চিন্তায় সারা রাত ঘুমাতে পারলো না আলী গওহর।

খুব সকাল থেকেই আদিনা-পাণ্ডুয়ার দরবেশ নবাবের দর্শন প্রার্থনায় দরবারে হাজির। অনেক সিপাহী-বরকন্দাজের দরজা ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শীর্ণকায় জীর্ণদেহ ছেঁড়া ঝোলা সম্বলিত দরবেশ।

নবাব অনেক রাত্রে ফিরেছেন গৌড় থেকে, এখনো ওঠেন নি বিছানা ছেড়ে, কিন্তু নাছোড়বান্দা দরবেশ। ঠায় গালে হাত দিয়ে বসে রইলো কয়েক ঘণ্টা। নবাব দরবেশের আর্জ্জি শুনতে চাইলেন,

কিন্তু দরবেশ একান্তে তার বক্তব্য পেশ করবার আবেদন জানাতেই ক্ষিপ্ত হলেন তিনি, কিন্তু বার বার অনুনয়ে একান্তেই ডাকলেন দরবেশকে। সহস্র বার বিশমিল্লার শপথ করে অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে আলী গওহরের চক্রান্তের কথা গোপন মহফিলের সবিস্তার বর্ণনা দিল দরবেশ। তারপর ধীরে ইকবালের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত ও বেগম মহলের আশমানতারার ঘটনা উচ্চারণ করার সাথে সাথে বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন নবাব।

—খামোস, তুমি কি করে জানলে এসব!

—হুজুর, বান্দা একবর্ণ মিথ্যে বলছে না, খোদার কসম।

—তুমি কি করে জানলে—তাই জানতে চাই?

—জী হুজুর, গওহর আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে বলেছিল, কিন্তু আমি আপনার নিমক খাই হুজুর, আপনাকে কথাটা না বলে পারলুম না খোদাবন্দ্।

ফারমান দিলেন নবাব তার রক্ষীকে—

—যাও, এই দরবেশকে চোর কুঠরীতে বন্ধ করে রাখ।

ভয়ে পা জড়িয়ে কেঁদে উঠলো দরবেশ। হুজুর, আপনি আমার মা-বাপ, মিথ্যে হলে আমার জান কোতল্ করুন হুজুর কিন্তু আমাকে কষ্ট দিবেন না জাঁহাপনা।

রাগে কিছুতেই মেজাজকে শরীফ করতে পারছিলেন না মীর মুবারক, দরবারে না বসে তিনি সোজা চলে এলেন গুলাবী বাঈ-এর মহলে।

অবাক গুলাবী।

—জাঁহাপনা, এ সময়ে হঠাৎ আমার ওপর মেহেরবাণী?

—হ্যাঁ বেগম, মনটা খুব ভারাক্রান্ত, মাত্র কয়েকদিন বাইরে থাকলেই শুন্‌ছি নিজের মহলও আজকাল বেইমানী করে, তাই ভাবছিলাম, এতদিন বাইরের দুশমনদের তাড়িয়েছি, এবার ঘরের দুশমনদের পালা।

—এ কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা?

—তুমি জান না বেগম কি ভয়ঙ্কর কথা শুনেছি, আমার রাজ্য যদি কোন শত্রু আক্রমণ করতো আমি তাতে এত অবাক হতাম না, কিন্তু একটি সংবাদ আমাকে বিশেষ চিন্তান্বিত করেছে গুলাবী।

—গোস্তাকী মাপ করবেন জাঁহাপনা, যদি হুকুম মিলে তো আমি দু'একটা কথা বলি।

—হুকুম কিসের! কি বলতে চাও তাই বল বিবি, তবে মিছে-মিছি আর সান্ত্বনার কথা শুনতে ভাল লাগে না, মনে হয় দিন দিন একা হয়ে যাচ্ছি, এ মহলায় তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই।

—না জাঁহাপনা, একথা বলবেন না, মহলের সবাই আপনাকে জান দিয়ে ভালবাসে, কিন্তু···

—কিন্তু কি ?

—আপনি যা শুনেছেন তা মিথ্যে জাঁহাপনা।

—কি শুনেছি তা তুমি কি করে বুঝলে বেগম !

—আমার ধারণা জাঁহাপনা। যদি আশমানতারার কিছু শুনে থাকেন তবে সব সত্যি।

—সত্যি ? তুমি যদি জানতে তবে আমাকে আগে কেন বলনি গুলাবী ?

—বলতে চেয়েছিলাম হুজুর, কিন্তু সেদিন বড় ক্লান্ত ছিলেন, ভেবেছিলাম পরদিন বলবো—আর বলা হয়নি।

অস্থির উন্মত্ততায় সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগলো নবাব। এক সময় গুলাবীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আপন মনে বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে।

তামাম মুল্লুক খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে সিপাহীরা কিন্তু পাখী পালিয়েছে। আলী গওহর একা পালায়নি সাথে পালিয়েছে তার প্রাণপিয়ারী সত্ত সাদী করা বেগম খলিদা বানু। বাসায় পাওয়া গেছে বৃদ্ধ নানাকে, প্রচণ্ড প্রহারে অজ্ঞানপ্রায় বৃদ্ধ চোর কুঠরীতে মৃত্যুর দিন গুনছে, আর এদিকে বাছাই করা সিপাহীর দল নিয়ে স্বয়ং মুবারক ছুটে গেছে পেয়াস বাড়ীতে, ইকবালের শির চাই।

সুচতুর ইকবাল মীর মুবারককে যোগ্য সম্মান দিয়েছে, আহ্বান জানিয়েছে লড়াইয়ের, হিম্মত থাকে তো নেমে এসো, সাফ জবাব জানিয়েছে ইকবাল।

শাহান শা আলীমর্দ্দানের রক্ষীদল ইকবালের এলাকা পাহারা দিচ্ছে। তাজ্জব বাৎ। মদৎ জুগিয়েছে নবাব আলীমর্দ্দান, বলেছে কুছ্ পরোয়া নাই।

হতভম্ব মুবারক।

এই সেদিনও দরবারে দাঁড়িয়ে নবাব আলীমর্দ্দান মীর মুবারককে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান বলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। আর আজ ইকবালকে তারই বিরুদ্ধে মদৎ জোগাচ্ছেন— তাজ্জব কি বাৎ!

মুবারক ব্যাপারটা বুঝতে চাইলো। গোপন তল্লাসী করে বুঝতে পারলো তামাম ঘটনার মূলে আলী গওহর।

রাগে গরগর করে উঠলো মুবারক, আনমনে বলে উঠলো:

—বেইমানের বাচ্চাকে পেলে টুঁটি টিপে মারতাম, কিন্তু তার স্বগতোক্তি বাতাসেই মিলিয়ে গেল।

বেইমানি করেনি আলী গওহর। আশমানতারাকে আনতে পারেনি কিন্তু নব যৌবনা বেগম খলিদা বানুকে সযত্নে তুলে দিয়েছে ইকবালের হাতে।

সুচতুর ইকবাল কাজে লাগাতে চেয়েছে এ সুযোগ, সোজা ছুটে গিয়েছে গৌড়ের নবাবের কাছে, সাথে মহামূল্য ভেট নজরানা খলিদা বানু।

সযতনে ধীরে ধীরে যে যৌবন কুসুম আলী গওহরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল তা মুহূর্ত্তে বিলীন হয়ে গেল। কেঁদে কেঁদে অচৈতন্য হোল কিশোরী, কিন্তু লালসার নাগপাশ থেকে মুক্তি কোথায়! মুবারক বুঝলো আলীমর্দ্দানের নারী লিপ্সাই ইকবালকে সুযোগ

এনে দিয়েছে, ঘৃণায় মনটা বিদ্রোহ করতে চাইল কিন্তু পথ কোথায়? চারদিকে শত্রু পুরী—সব্বাই দুশমন। তুচ্ছ একটা নারীর লোভে নবাব ইকবালকে আশ্রয় দিয়েছেন অথচ একদিন সব চেয়ে খুপসুরৎ জেনানা গুলাবীকে তুলে দিয়েছিলেন তার হাতে। তাজ্জব এই নবাব আলীমর্দ্দান।

মুবারক অনেক কৌশিস করে আভূমি নত হয়ে সম্রাট শাহান শা আলীমর্দ্দানের কাছে ইকবালের উদ্ধত্যের কথা বর্ণনা করতেই বিরক্ত হলেন শাহান শা, বললেন—তোমার কোন কথা বলার থাকতে পারে না মুবারক! ঘরের বিবিকে সামাল করতে পারনা বনের চিড়িয়াকে ধরে কি লাভ! যাও, হিম্মত অর্জ্জন করে এসো।

মুবারক চীৎকার করে বলতে চাইলো—জাঁহাপনা, আমার হিম্মত আছে কিনা তা কি আপনি জানেন না! আপনার সাম্রাজ্যের প্রতি ধূলিকণায় কি আমার শৌর্য্য-বীর্য্যের চিহ্ন নেই। কিন্তু বলাব সুযোগ মেলেনি মুবারকের, নবাব তার কথা শেষ করে চলে গিয়েছেন সম্মুখ থেকে।

উন্মত্ত হয়ে গৌড় থেকে ফিরেছেন মীর মুবারক। নবাবগঞ্জের দরবারে অগুন্তি প্রজারা নবাবের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছে, কিন্তু নবাব কারো সাথে দেখা করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

গত রাত বিনিদ্র কেটেছে তার, সর্ব্বাঙ্গে সর্পদংশনের মত জ্বালা, অস্থিরতায় সারা ঘরময় পায়চারী করেছেন তিনি। বেগম গুলাবী পরপর কয়েক বার দেখা করতে এসেছে জাঁহাপনার মহলে, হুকুম মেলেনি, ফিরে গেছে নারা। সে বুঝেছে নবাবের এ আঘাতের প্রয়োজন ছিল, আপন শক্তির অহঙ্কারে তিনি যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছিলেন আজ তা ভেঙ্গে যেতে বসেছে।

একটা করুণ হাসি গুলাবীর মুখে ভেসে উঠলো।

মুবারকের বার বার মনে হয়েছে তার অস্ত্রেই সে আহত হয়েছে। তার নির্মিত পথেই ইকবাল আলীমর্দ্দানের কাছাকাছি আসতে পেরেছে। কিন্তু নাঃ এর একটা চরম শাস্তি হওয়া দরকার। ইকবাল

আর গওহরের তাজা টাটকা খুন না হলে তার আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হবে না।

খুন চাই—তাজা খুন। অস্থিরতায় নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাত খুলে খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখে দেখে বললেন—মুবারক, এইবার তোমার সত্যিকারের যুদ্ধ, টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। হন্তদন্ত হয়ে আশমানতারার কাছে ছুটে এলেন মুবারক, আশমান তখনও ঘুমে, নবাবকে এ সময় হঠাৎ এখানে দেখতে পেয়ে হতচকিত খোজা বান্দাদের ঝিমুনি চমকে উঠলো।

নবাব শায়িস্তা আশমানতারার চুলের মুঠি ধরে গর্জন করে উঠেছে—জারিয়া বেতমিজ, তোকে আজ নিজের হাতে খুন করবো। আর্তনাদ করে উঠেছে আশমানতারা, চীৎকারে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে সারা হারেম। মুবারক এলো পাথাড়ি চাবুকের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে ফেলেছে আশমানতারাকে। তার পরিত্রাহি চীৎকারে আকাশ বাতাস আকুল হয়ে উঠেছে। নবাবের মুখোমুখী যাবার সাহস নেই কারো, গুলাবী বারবার যেতে চেয়েছে কিন্তু সাহস পায়নি।

সহসা পাগলিনীর মত ছুটে এসেছে বেগম মরীয়ম। একটা দুর্ধর্ষ রক্তপিপাসু দানবের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে সে। দু'হাতে নবাবের হাত জড়িয়ে ধরে বলেছে—নবাব, নবাব মাফি কর, ওকে মাফি কর নবাব, ও মারা যাবে—ও মারা যাবে নবাব।

কর্ণপাত করেনি মুবারক, এক ধাক্কায় দূরে ছিটকে ফেলেছে বেগম মরীয়মকে। আবার উঠেছে মমতাময়ী নারী, কপাল কেটে দরদর ঝরে পড়ছে তাজা লাল খুনের স্রোত তবু পায়ের ওপর হুমড়ী খেয়ে বলেছে—জাঁহাপনা, নারী হত্যা কোরো না, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও জাঁহাপনা।

বিরক্তিভরে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছে নবাব রক্তাক্ত দেহে বেগম মরীয়মের হাত ধরে তারই মহলে।

ভূ-লুণ্ঠিতা আশমানতারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রয়েছে তারই মহলে।

আশমানতারা অন্ধকার গুপ্ত ঘরে বন্ধ। আলোবাতাসহীন ঘরে চীৎকার উঠছে—পানি একটু পানি, বাঁচাও বাঁচাও, বাইরে থেকে সে শব্দ আকুল করে তুলছে সব্বাইকে, কিন্তু কার সাধ্য এগোয় সেখানে।

পুরো এক সপ্তাহ কেটেছে। কি কঠোর নারীর প্রাণ। পানি-পানি করে এক সময় নিস্তেজ হয়ে এসেছে আশমানতারার কণ্ঠস্বর, তারপর আর বিরক্ত করেনি।

সারা রাত সুরা পান করেছে মুবারক, পাশে রাত্রি জেগে সেবা করে চলেছে বেগম মরীয়ম! নিত্য দিনের মত আবার সূর্য্য উঠেছে, প্রদীপ্ত আলোয় ভরে উঠেছে জগৎ সংসার, রাজ্যের দিকে দিকে উঠেছে হাহাকার, প্রজারা করেছে বিদ্রোহ, নবাবের কানে শুধু একটি আর্তি বার বার তাকে উদভ্রান্ত করে তুলেছে।

পানি, একটু পানি, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

চারদিকে আশমানতারাব মূর্ত্তি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে। রক্তাক্ত গলিত দেহ নগ্ন আশমানতারা নবাবের পাশে এসে যেন কৈফিয়ৎ চাইছে নবাবের কাছে—চাইছে জানের বদ্‌লা।

সারা মহলায় ছুটোছুটি করেছেন নবাব মুবারক, এগিয়ে এসেছে খোজাবান্দার দল—এসেছে জারিয়া আর বেগমরা। সব শেষে মরীয়ম আর বেগম গুলাবী। কিন্তু কোন ভ্রুক্ষেপই নেই তাঁর, শুধু শূন্যে ভয়ার্ত্ত চোখ তুলে চীৎকার করে উঠেছেন—নেহি কভি নেহি, কভি নেহি। কখনো বা উন্মত্ততায় আপন হাত প্রসারিত করে বলে উঠেছেন—খুন, খুন, তারপরেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন তিনি।

খবর পেয়ে সারা দেশ থেকে ছুটে এসেছে হেকিমের দল। কিন্তু কোন দাওয়াই কাজ করছে না। মাথায় হাত দিয়ে বসেছে সবাই ভবিষ্যতের ভাবনায়। শেষ চেষ্টা করেছে বেগম গুলাবী, নবাবের হাত ধরে তার দৃষ্টির সম্মুখে গিয়ে ডেকেছে বারবার, দাওয়াই দিয়েছে

মুখে কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত নবাব আর বেগম গুলাবীর খুশ খবর জানতে চাননি মিষ্টি মুখে, বসরাই গোলাপের সাথে তুলনা করেননি তার রূপ লাবণ্যকে। বেদনায় চিক্‌চিক্ করে উঠেছে আঁশু, মনটা কেঁদে উঠেছে হু হু করে, পরক্ষণেই শক্ত হয়ে সাহসে বুক বেঁধেছে বেগম গুলাবী। চিড়িয়ার কি ডর থাকতে হয়? ডেরা পাল্টানোই চিড়িয়ার ধর্ম্ম। জিন্দগীতে আরও কতকি দেখতে হবে আল্লাই জানে। গুলাবী বুঝেছে এবার এখানকার ডেরা খুব শীগ্‌গীরই তুলতে হবে, তা না হোলে হয়ত কোন সিপাহীই বেওয়ারিশ মাল ভেবে ব্যবহার করবে তাকে। মরদকে চিনতে কি বাকি আছে তার! পেছনের ফেলে আসা অতীতের দিকে তাকাতেই সব মালুম হয় তার, উঃ, কি দুর্ভোগেই কেটেছে জীবন, ভেবেছিল এবার কারো পাক্কা আউরৎ হয়ে থাকবে, সংসার করবে, বাচ্চার মা হবে, অন্ধেরা শেষ হয়ে উজালা আসবে, কিন্তু তাও হোলনা নসীবে। রাত সোহাগী জেনানা হতে আর মন চায়না তার। হীরা মোতি জহরৎ সব ঝুটা লাগে আজকাল, ওসব শুধু মরদকে খুশী করার ইনাম মাত্র। পত্থরের তো জান নেই! এবার তাই জান নিয়ে কারবারের দিল ছিল বেগম গুলাবীর।

মন যেন গুণগুণিয়ে বলে উঠলো—চল যাই পুরাণা মুনিবের কাছে, শাহান শা আলীমর্দ্দানের কাছে। কিন্তু না, শাহান শা ঝুটা জহরৎ তো পসন্দ করেন না। আর তাছাড়া যে জহরৎ একবার মুবারকের কণ্ঠে শোভা পেয়েছে তাকে তো কখনই নয়। নবাবের জেনানা-বাগে ঝুটা মোতি বিলকুল নেহি, কথাটা মনে পড়তেই আপন মনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো—সত্যি মরদগুলো কেমন বুদ্ধু, এই বুদ্ধি নিয়ে এরা শাহানশা হয়! আল্লা জানে, একটাও সাচ্চা আছে কিনা।

তামাম দুনিয়া দেখবার কি দরকার। তেরো কি চৌদ্দ বরষ মাত্র, সালোয়ার কামিজ বানিয়ে দিল বাপজান, মাকে ডেকে বললো —দেখছিস আমার বেটি কেমন খুবসুরৎ হয়েছে, মালুম হচ্ছে কি

শাহান শা নবাবের বেটি তাই না ! প্রসন্ন মুখে মা'র দিকে তাকালেও মা যেন এসব কথাকে ছেঁদো কথা বলেই উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, যাও দেখি এবার চারটে খাবার ব্যবস্থা কর, খোয়াব পরে দেখলেও চলবে। সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে তার, মা'র কথায় বাবা যেন ব্যথা পেয়েছিলেন, তার বেদনার্ত মুখে যে অব্যক্ত ভাষা ফুটে উঠেছিল তা যদি মা বুঝতো তবে কখনোই বাবাকে ব্যথা দিয়ে কথা বলতো না।

সালোয়ার কামিজ পরতেই চাচাতো ভাই আবদুল আরো বেশী করে আসতে শুরু করলো আমাদের বাড়িতে। সুযোগ পেলেই কি সব কথা বলতো আমার সাথে, কোনটা বুঝতাম কোনটা বুঝতাম না, এমনি করে বেশ কিছুদিন কাটলো। আবদুলের সংস্পর্শ আমায় যেন অনেক নতুন রাজ্যে পৌঁছে দিল, আমি সব বুঝলাম। পনেরোয় পা দিতে না দিতে আমি সেয়ানা হয়ে উঠলাম মা'র কাছে। পাড়া-পড়শীরও যেন চোখ টাটাতে লাগলো কিন্তু সব কিছুকে বাতিল করে মা বাবার কাছে কথাটা পাড়লেন। আবদুলের সাথে সাদীর ব্যবস্থাটা খুব শীগগীর করতে হবে।

মা'র কথাকে অমান্যি করবে এমন সাধ্য বাবার ছিল না, তাই আবদুলের বাবার কাছে কথাটা পাড়তেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি—নেহি কভি নেহি। অনেক বেশী লোভের কাছে বিক্রি হবার জন্য আমার চাচা তখন প্রস্তুত। আবদুলটাও একদম ডর পোক, হিম্মৎ নেই এক ফোঁটা অথচ ইচ্ছেটা যেন তামাম আশমানকে হাতের মুঠোয় আনবে। চিড়িয়ার দিল নিয়ে কি মোহব্বৎ হয়! আবদুলের যাতায়াত বিলকুল বন্দ্‌ হয়ে গেল আমাদের বাড়ীতে। মা'র চোখ দুটো সব সময় যেন বান্দার মত নজর রাখতো আমার ওপর। আবদুলকে আমারও ভাল লাগতো না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কেমন যে হয়ে গেল মনটা সব সময় আবদুলের কথাই মনে পড়তো। সাকীনা বলতো, পহেলা মহব্বতে ঐ রকমই হয়। আবার জীবনে এলো জায়রুল ইসলাম, এলো নসরুল্লা খাঁ, মীর্জ্জা হায়দার কিন্তু

সব্বাই যেন মুরগীর বাচ্চা। ফুঃ, না আছে জোর করে ছিনিয়ে নিবার হিম্মৎ, না আছে গভীর বুদ্ধি। যে মরদ জেনানার কাছে করুণা ভিক্ষা করে, মহব্বতের জন্য আঁশু ফেলে, সে মরদ জেনানার সামিল। হ্যাঁ ছিল বটে শাহান শা মুবারক, তামাম দুনিয়ার হিম্মৎ ছিল দিল-এ। কুছ্ ডর ভয় ওকে কাবু করতে পারে না। জান কুরবানা লেকিন মরদকা শির হরদম উঁচা। তাইতো বেশ কিছু দিন খুশীতেই ছিল গুলাবী, কিন্তু এখন!

একটা হপ্তা পুরা পার হতে না হতেই শাহান শার' ওপারের ডাক এসে গেল, চোখ বুঁজলেন তিনি, পিছনে পড়ে রইলো তামাম দুনিয়া। কেউ কেউ একফোটা আঁশুও ফেললো না লোকটার জন্যে, কিসমতের কি বিচার! বরঞ্চ খুশীয়ালা এলো প্রজাদের মনে। শুধু সানারাত পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো তার প্রথমা বেগম মরীয়ম আর গুলাবী, এক সময় বুঝতে পারলো বেচারা নবাবের জন্য তার চোখেও আঁশু ঝরছে!

গুলাবী বুঝলো সন্দেহ হতে না হলেই নবাব আলীমর্দ্দানের ফতোয়া নিয়ে আবার হয়তো কে শাহান শা হবে এখানকার। হয়তো বা ইকবালই আসবে এখানে। সবাই আবার সেলাম জানিয়ে বলবে—হুজুর আমরা আপনার বাঁদী, তারপর নবাবের মর্জ্জি মাফিক জেনানাদের দেহ নিয়ে সেই পুরাণো খেলা। বিরক্তিতে আপন মনেই বিড় বিড় করে উঠলো গুলাবী। জ্ঞাতি শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে দেশ থেকে একদিন পালিয়েছিল সে। সেই নয়া জওয়ানা নিয়েও ভয় করেনি দুশমনকে, নানা বুদ্ধি করে হাজির হয়েছিল ওমরাহ গণী দেওয়ানের কাছে। তারপর নসীবই তাকে পাঠিয়েছিল শাহান শার' কাছে, ভোগে লাগলোনা শাহান শা'র। কিন্তু মুবারক তাকে দিয়েছিল বেগমের আসন, বসিয়েছিল নিজের দিল্-এ। মোহব্বৎ-এর তামাম সাম্রাজ্য ঢেলে দিয়েছিল ওর পায়ে, লেকিন সব নসীবে তো সুখ সয় না, তাই মুবারক দুনিয়া থেকে ছুটি নিয়ে গেল।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললো গুলাবী। না আর বেগম নয়, এখন অতি সাধারণ জেনানা। নবাবের দেয়া শৌখীন জিনিষপত্র সব ফেলে স্রেফ বাঁচার মত পয়সা কড়ি নিয়ে সবেরার আলো ফুটতে না ফুটতেই বেরিয়ে গেল গুলাবী অজানা পথের ঠিকানায়।

গুলাবীর মনটা যেন এই প্রথম বেদনায় ছলছল করে উঠলো। কত মরদ দেখলো, কত জনকে নাচাল, ওঠ-বোস করালো, কিন্তু মুবারকের মতন মরদ সত্যি নজরে পড়েনি তার! হিম্মৎ আর জোস যে দেখাতো তাকেই বকশীশ দিত মুবারক, বলতো--আমি ডরপোক ভীরুকে যেমন ঘৃণা করি, তেমনি হিম্মৎদারকে পেয়ার করি। আনমনে বিড় বিড় করে উঠল গুলাবী—খোদা, মেহেরবান মুবারককে বেহেস্তে ঠাঁই না দাও আফশোষ নেই, কিন্তু দোজকের দুখ ওকে দিওনা খোদা। আর কেউ না জানুক, না বুঝুক, তুমিতো জানো তামাম দেশ যখন ওর বিরুদ্ধে দুশমনি করছে তখনো ও একা আপন হিম্মতে মরদের মত লড়ছে তাগৎ দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে। তাই নবাব বুঝি স্রেফ খুনই পছন্দ করতো না, খুনী রং-এর গুলাব ভী পসন্দ করতো।

অনেক দিন পর নিজের চোখে আঁশু এলো গুলাবীর।

মুবারকের মৌতের খবর পেয়ে দুঃখ পেলেন লক্ষৌতির নবাব আলীমর্দ্দান। সাথে সাথে দিল থেকে যেন একটা বিরাট দুশ্চিন্তা মুছে গেল মুহূর্তে। শেষের দিকটায় মুবারক বড় বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। বিশ্বাস নেই মানুষকে, ক্ষমতার লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য অর্ব্বাচীন করে তোলে। কথাগুলো মনে হতেই অতীতের দিকে মনটা ছুটে যেতে চায়, সেই বারোশো তিন খৃষ্টাব্দের কথা। ইখতিয়ারের শুধুমাত্র সৈনিক হয়ে বাংলায় পদার্পণ, তারপর দেবকোটের সেই দিনগুলি। আনমনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নবাব আলীমর্দ্দান। অতীত তার মনে ভিড় করলো—

দেবকোট।

নবাব ইখতিয়ার খলজী অসুস্থ অবস্থায় কাল কাটাচ্ছেন। হেকিমের কমতি নেই তবু রোগ সারেনা জাঁহাপনার। হাজারো রকম ব্যবস্থাকে মিথ্যে করে দিয়ে নবাব কেমন শুকিয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। বিশ্বস্ত অনুচর আলীমর্দ্দান সর্ব্বক্ষণ হুজুরের কাছে মোতায়েন। পান থেকে চূন খসবার উপায় নেই, জাঁহাপনা যেন কোন কষ্ট দুঃখ না পান সে চেষ্টায় সারা রাত জেগে সেবা করে চলেছে সে। দুর্ব্বল নবাব মাঝে মাঝে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছেন—আলী, কেরামতের কি খেল্ ছ্যাখছ? আপনজনেরা যা করলো না তুমি তাই করলে। তুমি আমার ভাই ছিলে আলী, তুমি আমার বেটা ছিলে। খোদা তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন।

হ্যাঁ, মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিল খোদা ঠিকই। সেই নিরস্ত্র অসহায় পংগু নবাবের বুকে ছুরি বসিয়ে আলীমর্দ্দান তার প্রভুর গুরু-দক্ষিণা দিয়েছিল সেই দিন। হতভাগ্য নবাব কথা বলার সুযোগ পাননি, শুধু মুহূর্ত্ত মাত্র আলীমর্দ্দানের মুখের দিকে খুব ভাল করে তাকিয়ে কাতর কণ্ঠে শব্দ করেছিলেন—খোদা। ফিন্‌কী দিয়ে বৃদ্ধের স্তিমিত খুন ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। সেদিনের ঘটনাটা আজো চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে আছে তার। কি জানি মুবারক যে রকম বিশ্বস্ত ও শক্তিমান হয়ে উঠেছিল সেজন্য হয়তো তাকে অনেক ভুগতে হতো। খোদা যা করেন, ভালর জন্যই করেন। তবে ইকবালের ব্যাপারেও বহুত হুঁসিয়ার থাকতে হবে তাকে। বিল্লির বাচ্চাকে বাঘ বানাতে নাই, তাহলেই ঝুটমুট ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়।

মুবারকের খবর শোনামাত্রই নবাব আলীমর্দ্দানের কাছে পৌঁছে গিয়ে লম্বা সেলাম জানালো ইকবাল। মুবারকের হাতে যে এলাকা ছিল তার কর্ত্তৃত্ব চাই। এদিকে বেশ কিছু সিপাহী ততক্ষণে পৌঁছে

গেছে মুবারকের রাজ্যে। এতক্ষণে রটিয়ে দিয়েছে এ এলাকার মালিক সদর-ই-ইকবাল।

আলীমর্দ্দান ওমরাহদের সাথে বসে তার তামাম এলাকার খবরাখবর নিচ্ছিলেন। ইকবালের আবেদন শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—ব্যস্ত কেন! বিশ্রাম কর, পরে বাৎ-চিৎ হবে। কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই হুজুর, এক্ষুণি না গেলে হয়তো কাফেররা হুজুরের সাথে বেইমানী করতে পারে।

—কি? অবাক হয়ে রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে ইকবালের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—বেইমানী কে করবে ইকবাল! কাফেররা, না তুমি নিজে?

—একি বলছেন হুজুব!

বিনয়ে পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ইকবাল। বললো—হুজুর আমি কি কোনদিন হুজুরের সাথে বেইমানি করেছি? যদি গোস্তাকী, বা কোন ভুল করে থাকি, তবে আমাকে শাস্তি দিন জাঁহাপনা।

গলে গেল নবাবের মন, খুশী হয়ে বল্লেন—ইকবাল আমি তোমাকে এই ছোট এলাকার মালিক করতে চাইনা, ওর চেয়ে অনেক বড়জায়গার মালিকানা দিতে চাই।

স্তব্ধ হতবাক হয়ে ওমরাহরা নিশ্বাস বন্ধ করে হুজুরের ফরমাস শুনছেন আর ইকবাল বোবা দৃষ্টিতে নবাবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেক ভেবেচিন্তে বল্লেন—শুধু ইকবালই নয়, আমি সব ওমরাহদেরই কিছু কিছু জায়গা দিয়ে দিতে চাই, তারপর উজীরের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—ওদের সবাইকে গজনী, ইস্পাহান, ঘুর ও খোরাসানের জায়গা বিলিব্যবস্থা করে দাও। যাও মনে রেখো আমি স্বাধীন নবাব, আমার হয়েই তোমরা সেখানকার মালিকানা ভোগ করবে।

কথা শুনে সব্বাই হতবাক। শাহান শা কি মতিচ্ছন্ন হয়ে গেল নাকি! বাংলাদেশের রাজধানী গৌড়ের শাসনকর্তা তিনি।

দিল্লীর হুজুরের ফরমানে এতদিন মালিকানা করছিল সে, ইস্তক বিন্তি কাবার হবার সাথে সাথেই নবাব সাহেব নিজেকে স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করলো কিন্তু মাথাটাও কি বিগড়ে গেল সাথে সাথে! কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় গজনী, বা ইস্পাহান।

সবাই মিলে বসলো উজীরের সাথে। ব্যাপার কি? নবাবের হুকুমের সামনে কিছু বলতে পারেননি উজীর সাহেব, কিন্তু ওমরাহদের প্রশ্ন শুনে হেসেই খুন তিনি। আরে তউবা-তউবা, হুজুরের নামে কি ঝুটা কিছু বলতে আছে, তবু চুপ করো বলছি, আল্লার কসম তোমরা কাউকে কিছু বলো না, শুধু শুনে যাও—কি করতে হবে তোমাদের। উৎকর্ণ হয়ে রইলো সব্বাই। উজীর সাহেব অনেক চিবিয়ে চিবিয়ে সুতো ছাড়লেন। জানা গেল সে সমস্ত জায়গায় নবাব তো দূরের কথা, নবাবের কোন পূর্ব্বপুরুষও কস্মিনকালে কর্তৃত্ব করেন নি। নেহাৎ ঝোঁকের মাথায় তিনি সে সমস্ত জায়গা বিলি বন্দোবস্ত করেছেন। কথা শুনে মনে মনে মুসড়ে গেল সব্বাই, এত বড় একটা দাঁও নষ্ট হয়ে যাওয়াতে কেউই খুশী হতে পারলো না।

ইকবাল ছটফট করছিল মুবারকের জায়গীরটা হাত করবার জন্য কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে মরীয়া হয়ে আবার নবাবকে কুর্ণিশ জানালো নিভৃতে। কিছু জরুরী বাৎচিৎ আছে হুজুরের সাথে। নবাব শাহান শা দেওয়ানীতে বসে একটা মিলাদ মহফিল করা যায় কিনা সে সব আলোচনা করছিলেন মৌলানার সাথে। ইকবালের উপস্থিতি তাকে বিরক্ত করলো, কিন্তু ইকবালের করুণ নিবেদনে তিনি দয়ার্দ্র হয়ে বললেন—

—ক্যা বাৎ ইকবাল, এখনো নিজের এলাকায় ফিরে যাওনি?

—নেহী হুজুর, কিছু গোপন খবর দিতাম আপনাকে, নবাব ইকবালের ইংগিত বুঝে মৌলানাদের পাশের ঘরে যাবার নির্দ্দেশ দিয়ে বললেন—বোলো ইকবাল ক্যা খেয়াল হ্যায় তুমহারা দিল্‌মে খোলসা করো।

অনেক বুদ্ধি করে শেষ অস্ত্রটা ছাড়লো ইকবাল, বললো—

—হুজুর, গোলামের গোস্তাকী মাফ করবেন, যদি হুকুম করেন তো…

—আরে বোলনা বেইকুফ! ধমক দিলেন অস্থিরচিত্ত নবাব।

—হুজুর, মুবারকের এলাকায় হাজারো খুপসুরৎ গুলাব, দেখলে দিল খারাপ হয়ে যাবে আপনার।

—কি রকম! কৌতূহলী হল নবাব।

উৎসাহিত হল ইকবাল, বললো—জাঁহাপনা, মুবারক পেয়ারের সাচ্চা সমঝদার ছিল, তামাম পেশোয়ার আর বাংলার আচ্ছা আচ্ছা গুলাব তুলে নিয়ে জমা করেছিল ও।

ইকবালের কথা বলার ধরনে হেসে উঠলেন নবাব, হেসে বললেন—

—ঠিক হ্যায়, তুমিই ওখানকার শাসনকর্তা, উজীরকে বলে রাখবো, আমার পাঞ্জা নিয়ে যেও।

খুশী হয়ে আজানুলম্বিত সেলাম জানিয়ে উঠতেই গম্ভীর স্বরে বললেন শাহান শা—ইকবাল, ইয়াদ রেখো তুমি আমার অধীন থেকে প্রজাদের দেখাশুনা করবে, খবরদার বেইমানী করেছো কি ব্যস্ মুরগীর মত খতম্ করবো!

ফ্যাকাশে মুখে জবাব দিল ইকবাল, জী জনাব তাই করবেন, সেলাম।

সারা রাস্তা একই ভাবনা ইকবালকে অস্থির করে তুললো। শাহান শা আদ্‌মী ভাল, কিন্তু কেন যে মাঝে মাঝে বিগ্‌ড়ে যান তা বোঝা যায় না। কানের কাছে কে যেন বার বার বলছিল—ইকবাল ইয়াদ রেখো, তুমি আমার অধীন, খবরদার বেইমানী করেছ কি ব্যস্ মুরগীর মত খতম করবো।

নবাবকে কি করে খুশী করা যায় সেই ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো ইকবাল, সত্যি কি খুপসুরৎওয়ালীরা আছে ওদেশে! নাকি ওসব আশমানতারার মত ঝুটা মাল। আলী গওহরের কথা ইয়াদ হোল ইকবালের। ঠিকতো আলী গওহর একটা আচ্ছা চিজ্ দিয়েছিল

বটে, হয়তো আরো অনেক খবর ওর ঝুলিতে থাকতে পারে! দেখা যাক্ নসীবে কি আছে! আপন মনেই হাসি পায় ইকবালের, হায়রে তুনিয়া, সিপাহীকা নোকরি লিয়ে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে যার জান গেল, আর সে এখন কিনা আমাকে বলছে বেইমানীর কথা। আজব তুনিয়া আর আজব এই তুদিনের বাদশা শাহান শা আলীমর্দ্দান।

একলাথীর মহলে শূন্য দৃষ্টিতে আশমান জমিন ভাবছিলেন লক্ষৌতির পূরোণো নবাব হুসামুদ্দিন। দেখতে না দেখতে চোখের সামনে এসব ঘটনা ঘটে যাবে একথা কোনদিনই মনে হয়নি তার। দিল্লী থেকে বহুদূরে সব রকম ঝামেলা মুক্ত হয়ে জীবনটা এখানেই কাটাতে পারবেন তিনি, এই আশাতেই প্রজাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে আসছিলেন বরাবর। কিন্তু তগদীর বেইমানী করলো, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো জুলুমবাজ আলীমর্দ্দান, বলা নেই কওয়া নেই, খালি জুলুমের ওপর জুলুম চালালো সারা দেশে। একবার মনে হয়েছিল আলীমর্দ্দানের সাথে যুদ্ধেই শক্তির পরীক্ষা হোক, কিন্তু লড়বে কাকে নিয়ে, সিপাহীরা সব ডর পোক, আলী-মর্দ্দান ঢুকতে না ঢুকতে তামাম এলাকা ফাঁকা—বিলকুল সাফ। ভালই করেছে সেলাম জানিয়ে, তা নাহলে গোঁয়াররা জান খতম করে দিত হয়তো।

আপন মনেই বিড়বিড় করে উঠলো নবাব হুসামুদ্দিন। আর কি সেই দিন আসবে না, নবাবী মিলবে না, বাকি জীন্দ্‌গীটা কি এই রকম কাটবে!

—একা বসে বসে কি ভাবছেন আব্বাজান।

—কে! জিন্নাতি, আয় কাছে আয়।

—আপনার জন্য বাইরে কয়েকজন ওমরাহ অপেক্ষা করছেন আব্বাজান, তাদের কি ভিতরে নিয়ে আসবো?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পঞ্চদশী কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে নবাব বল্লেন।

—বেটি, তোর খুব কষ্ট নারে!

—না তো আব্বাজান।

—তোকে আজ বাইরের লোকের সাম্নে বেরোতে হচ্ছে তাই না?

—আর তো অন্য কেউ নেই আব্বাজান।

বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরোল নবাব হুসামুদ্দিনের। ক্লান্ত কণ্ঠে বল্লেন—যা, যারা দেখা করতে এসেছেন তাদের নিয়ে আয় এখানে। কিই বা হবে আমার সাথে দেখা করে, অস্ত্র-শস্ত্রহীন বৃদ্ধ সিংহের মত এখানে অন্ধকারে বসে থাকা ছাড়া আর কি কোন পথ আছে আমার!

—সেলাম হুজুর সাহেব।

একসাথে কয়েকজন ওমরাহ ঘরে ঢুকে সেলাম জানালো নবাবকে। নবাব উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সাদর আহ্বান জানিয়ে বসতে দিলেন সম্মুখের কুর্শিতে।

তারপর বল্লেন—এই গরীবের আস্তানায় হঠাৎ আপনারা কি মনে করে?

—কেন নবাব, আসতে নেই নাকি।

না, না, তা কেন, আপনারা এলেতো কলজেতে জোর পাই, এই নির্ব্বাসিত জীবন আর ভাল লাগে না বুঝেছেন।

—সেই জন্যই একটা খবর নিয়ে এলাম নবাব।

—আব নবাব বলে কেন ঐ শব্দের অপমান করছেন গাজী সাহেব, আমি ও নামের যোগ্য নই। তা-না হোলে কি বাংলা দেশে তুর্কী শাসন শুরু হয়!

—আপনি ভেঙ্গে পড়ছেন কেন নবাব, দিনের পর যেমন রাত হয়, তেমনি রাতের পর ফের দিন। অন্ধেরার পর উজালা কি হয় না নবাব?

করুণ হাসি হাসলেন নবাব হুসামুদ্দিন, তারপর বল্লেন—

—কি খবর এনেছেন গাজী সাহেব তাতো বল্লেন না।

—হ্যাঁ, মুবারকের এন্তেকাল শেষ হবার পর সেই জায়গায় শাসনভার পেয়েছে ইকবাল, মহল্লায় জোর খুশীর জাত উড়ছে। তামাম এলাকায় ইকবালের সিপাহী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে আর···

—আর ?

—আর ইকবাল ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে খুপসুরৎ জেনানা, ভেট দিতে হবে কিনা, তাই।

কথা শুনে চুপচাপ রইলেন নবাব হুসামুদ্দিন, তারপর বল্লেন—

—এ আবার নূতন উপদ্রব শুরু হোল তাহলে। এতদিন তামাম মুল্লুক জখম করেছে মুবারক, এখন হয়তো সেই ছোকরা মুবারককেও ছাড়িয়ে যাবে। হিম্মৎ দেখাতে হবে তো, তা না হোলে যে আলীমর্দ্দানের পয়জার লাগবে মাথায়।

হেসে উঠলো ওমরাহবৃন্দ, গাজী সাহেব বল্লেন—

—আর তো চুপ করে থাকা যায় না নবাব, ফিকির বের করতে না পারলে এমনিভাবেই আমাদের জিন্দগী কাবার হয়ে যাবে জাঁহাপনা।

নবাবের ইংগিতে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন সবাই। কন্যা জিন্নাতি কিছু পানীয় দিয়ে গেল। নবাব করুণভাবে একবার তাকিয়ে ওমরাহদের উদ্দেশ্যে বললেন—জানেন, বেটি আমার জানের টুকরো। জীবনে দুঃখ কাকে বলে জানতো না, আশমানের সুরজ ওকে কোনদিন দেখেনি, আর এখনকার অবস্থাতো বুঝতেই পারছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নবাব।

মদনাবতীর ওমরাহ বললেন—জনাব, আলীমর্দ্দানের সাথে লড়াই করার সাধ্য তো আমাদের নাই, তাছাড়া ঐ ইকবাল ছোকরা এখন নবাবের হয়ে লড়বে, তাই বলছিলাম অন্য কোন ফন্দী করার কথা।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন গাজোলের ওমরাহ আলী মেহমুদ—আমার কিন্তু মনে হয় আমরা যদি এক সাথে আলীমর্দ্দানকে আক্রমণ করি, তবে হয়তো ওকে খতম করা খুব অসুবিধে হবে না, গাজী সাহেব মাথা দুলিয়ে বল্লেন—হ্যাঁ ইকবালকে

যদি সিংহাসনের লোভ দেখানো যায়, তবে হয়তো আমাদের সাহায্য পেলে ও নিজেই একাজে অগ্রণী হবে।

নবাব হুসামুদ্দিন সব শুনে বল্লেন—দেওয়ালেরও কান আছে এই কথাটা মালুম রাখবেন, আর যা ভাবছেন তা যতক্ষণ কাজে না পরিণত হচ্ছে তার আগে আর কারো কাছে ঘূণাক্ষরে বলবেন না। আমার মনে হয় গাজী সাহেবের পরামর্শ মন্দ নয়, কিন্তু এই প্রস্তাব নিয়ে কে যাবে সেই গোঁয়ার ছোকরাটার কাছে।

বলতে বলতে চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো নবাব হুসামুদ্দিনের। আলী মেহমুদ বল্লেন, ঠিক আছে আপনারা সব্বাই যদি পবিত্র কোরাণের নামে কসম করেন, তবে আমিই সেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করতে পারি।

—আমাদের কি তাহলে বিশ্বাস করছেন না মেহমুদ সাহেব?

না গাজী সাহেব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, কথাটা হচ্ছে জীবন-মরণের সমস্যা, সুতরাং রাজনীতিতে শুধু বিশ্বাসের মূল্য খুবই কম, তাই কসমের কথাটা বল্লাম।

নবাব মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বল্লেন, কথাটা ঠিকই বলেছেন মেহমুদ সাহেব, ঠিক আছে আপনার ওপরেই দায়িত্ব রইলো।

আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো গাজী সাহেব?

—না, আপত্তি কিসের, তবে এ ব্যাপারে চারদিকে কিছু লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো কিছু খবর নেয়া দরকার। সম্ভব হোলে দিল্লীতে গিয়েও কিছু আঁচ করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা উচিৎ, কি বলেন নবাব সাহেব!

গাজী সাহেবের মূল্যবান প্রস্তাবে সবাই সম্মত হলেন, ঠিক হোল আবার আগামী সপ্তাহে সবাই মিলিত হবেন এক জায়গায়, তবে এখানে নয়, পাণ্ডুয়ার খলিফার বাড়ীতে গভীর রাত্তিরে।

ওমরাহরা সবাই বেরিয়ে গেলেন একসাথে। নবাব হুসামুদ্দিন সব্বাইকে আবার তার দীন কুটীরে আসবার আহ্বান জানালেন। নিজেকে বড় অসহায় মনে হোল তাঁর, কি মূল্য এই জীবনের। আজ

আমীর কাল ফকির এই তো ছুনিয়া। মাঝে মাঝে মনে হয় কাজ নেই এই সব ঝামেলার, কোন দরকার নেই নবাবীতে, সাধারণ মানুষের মত জীবনটা কাটিয়ে যেতে পারলেই ভাল, কিন্তু পারবেন কি সেভাবে জীবন কাটাতে।

ওমরাহদের আশার বাণী মনে নূতন করে চেরাগ জ্বালছিল, ওদের চেষ্টা হয়তো বা সফল হতেও পারে। একটা ক্ষীণ আশার আলো অন্ধকারের বুক চিরে জ্বল জ্বল করে উঠলো। হুসামুদ্দিনের মনে হোল—নাঃ আর সে অসহায় নয়, খোদা নিশ্চয়ই তার সহায় হবেন, তা না হোলে ওমরাহরা উপযাচক হয়ে কেনই বা তাকে সাহায্য করতে চাইছে, নাকি এও কোন ছলনা। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কেমন গুলিয়ে গেল সব নবাব হুসামুদ্দিনের। তিনি আবার অসহায়ের মত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জানলার বাইরে।

জিন্নাতি ঘরে এসে ডাকলো—আব্বাজান, কি ভাবছো বসে বসে।

—অ্যাঁ, যেন চমকে উঠলেন তিনি, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন—চুপচাপ বসে আছি বেটি, কিছুই ভাল লাগছে না, বুড়ো হয়ে গেছি তো তাই আর নতুন করে কিছু ভাবতে ভাল লাগছে না।

জিন্নাতি ধীরে ধীরে নবাবের পাশে এসে মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো—আব্বাজান।

—কি বেটি।

—চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

—কোথায় বেটি ?

—অনেক দূরে যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না, ছুশমন থাকবে না।

—তা হয়না বেটি, একবার নবাবীয়ানা করলে তার গন্ধ যে জিন্দগী ভর বয়ে বেড়াতে হয় রে, চিনবে না বললেই হয় !

জিন্নাতির করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে নবাবের অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করলো কিন্তু কচি-কিশোরী মেয়ে, কি করে বুঝবে রাজ-নীতির কুটিল চক্রান্ত কত ভয়াবহ কি ভীষণ মারাত্মক। তা যদি না

হোত তবে কি এতদিন নিশ্চুপ হয়ে এখানে বসে থাকতেন তিনি, কিন্তু উপায় নেই, সব দিকের পথ বন্ধ, আলীমর্দ্দানের ধূর্ত্ত চোখকে ফাঁকি দেয়া অত্যন্ত কঠিন।

জিন্নাতি নবাবের হাত ধরে মহলার ছাদে এলো। রাত বেশ বেড়েছে। সারা দুনিয়াভর চান্দের চেকনাই উজ্জ্বল আলোয় কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে জায়গাটা। জিন্নাতি হঠাৎ নবাবের হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে—আব্বাজান, তোমার চাঁদের আলো ভাল লাগে না ?

—লাগে।

—তবে তো মাঝে মাঝে এই ছাদে এসে একটু বসতে পার।

—পারি, কিন্তু ইচ্ছে করেনা বেটি।

—কেন আব্বাজান ?

—আমার সমস্ত ইচ্ছে মরে গেছে। আমি শেষ হয়ে গেছি, আমি বিলকুল খতম হয়ে গেছি।

—ছিঃ আব্বা, ও কথা বলতে নেই, তুমি না শাহান শা নবাব ছিলে, তোমার মুখে কি ও কথা মানায় আব্বাজান !

—কি করবো বেটি, সত্য নিষ্ঠুর হলেও সত্য।

কথা বলতে বলতে চকিতে থামলেন নবাব, তারপর অন্যমনস্ক-ভাবে বললেন—

আমিও একদিন কালিন্দী মহানন্দার ঢেউ দেখতাম, জোয়ারের ঢেউয়ের মত খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠতাম, ভালবেসে প্রজাদের ডাকতাম, কিন্তু কি হোল জীবনে ! না পারলাম তোদের মনের সাধ মেটাতে, না পারলাম প্রজাদের কিছু করতে। দুনিয়ামে ঝুট্‌মুট আনা—অউর ঝুট্‌-মুট যানা। জিন্নাতি অবাক চোখে তার স্নেহময় আব্বাজানের দিকে তাকিয়ে ভাবলো—তামাম হিন্দুস্থানে আব্বা-জানের মত দুখী অসহায় বোধ হয় আর কেউ নেই।

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে গুলাবী, আর পা চলতে চাইছেনা,

তাছাড়া বোরখায় ঢাকা অবস্থায় আরো কষ্ট হচ্ছে চলতে। বোরখা খুলে পথ চলাও বিপদ, এখন পথে ঘাটে অগুন্তি সেপাই মেয়ে ধরার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে যত ভেট দিতে পারবে আখেরে সেই লাভবান হবে এই রাজ্যে।

ফর্সা গায়ের চামড়া দেখলেই আপন জনের অভাব হবে না, হাজারো কিসিম প্রশ্ন কৈফিয়ৎ, তার চেয়ে এই ঢের ভাল, বোরখার ভেতর থেকে বেওয়া বিধবা বল্লে পার হওয়া যাবে। আপন মনেই হাসি পায় গুলাবীর, সাত্যি দেশটা কি হয়ে গেল—জেনানা জেনানা করে তামাম মানুষগুলো কেমন ক্ষেপে উঠেছে অথচ ঢুঁড়তে গেলে দেখা যাবে সত্যিকারের মরদ নেই, সব ব্যাটা ভিকৃমাঙ্গা। দুপুর প্রায় গড়িয়ে এলো। গনগনে রোদ্দুরে পথ চলাও বিপদ, তারপর পিয়াসে ছাতি শুকিয়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে। সাত পাঁচ ভেবে গ্রামের এক দরগাহায় গিয়ে বসলো গুলাবী।

দরগাহার ইমাম দুঃখী বেওয়ার সব করুণ কথা শুনে পানি দিলেন আর সমাজ ব্যবস্থায় জেনানাদের কি উচিৎ এবং কর্তব্য তার ওপর নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে আরো কিছু দূরে বড় দরগাহার খোঁজ দিলেন গুলাবীকে। মনে মনে খুব এক চোট হেসে নিল গুলাবী, তারপর পথ ধরলো সেই দরগাহার উদ্দেশ্যে।

প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে। অনেকটা পথ চলে এসেছে গুলাবী, জীবনে যাকে সূর্য্যের আলোর স্পর্শ পেতে হয়নি সে আজ মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে ভয়শূন্য হয়ে। কিন্তু কিসের জন্য এ পথ চলা! জওয়ানী বাঁচানো না জান? কোন কিছুরই তো পরোয়া করে না সে, নিজেকেই প্রশ্ন করে বসলো গুলাবী। হাঁটতে ভাল লাগছে তার, এ এক অদ্ভুত স্বাদ—পথ চলার আনন্দ। সারাজীবন তো নাচ-গান বাজনায় হীরা-মুক্তা জহরৎ-এর ভাণ্ডারে বসে বসে কেটেছে, এবারের সাথী পথের ধূলো আর দেহের ক্লান্তি। খুব ছোট বয়েসে আম্মাজান বলতো, বেটি রৌদ্রে যাসনা শরীরের রং কালো হয়ে যাবে, সাদী হবে না, সে কথা মনে আসায় করুণ হাসি

এলো গুলাবীর, সাদী! কি দরকার সাদীর, নিয়ম মত একজন মরদের সঙ্গদান করা ছাড়া তো আর কিছু নয়, তার চেয়ে এই তো ভাল, যখন দিল চাইবে তখুনি নয়া নয়া জওয়ানীর কাছে যাওয়া যাবে, মহব্বতের সুরমা মেখে বুঁদ হয়ে আওয়ারা হওয়া যাবে। গুলাবী এক সময় দরগাহায় এসে পৌঁছল।

অসময়ে বোরখা পরিহিতা জেনানা দেখে ছুটে এল দরগাহার খিদমৎকার, বৃদ্ধ মানুষ। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে হাঁটতে হয় তাকে। মাথার চুল থেকে ভুরু এবং সব পেকে ধবধব করছে। ইয়া বড় বড় দাড়ি আর একটু বাড়লেই মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থা। গুলাবী এই প্রথম অচেনা একজনকে সালামওয়ালেকুম জানিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করলো. তারপর বৃদ্ধের প্রশ্নের জবাবে জানাল তার মত দুখী বেওয়া ত্রিভুবনে আর দ্বিতীয়টি নেই। স্বামী পুত্র সর্ব্বস্ব হারিয়ে আত্মীয়-স্বজন নির্বান্ধব হয়ে এখন অকূল সাগরে ভাসা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই, তাই অন্ততঃ দু'একদিনের জন্য মেহেরবাণী করে খোদার ঘরে আশ্রয় পেলে তার জিন্দগী ধন্য হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ বেওয়ার দুঃখে অভিভূত হয়ে উজু করার পানী এনে দিলেন। জলপান, শীরণী আরো কিছু এনে সামনে বসে খাওয়ালেন, তারপর ধীরে ধীরে জট খুলতে লাগলেন নিজের সংসারের। তামাম মুল্লুকের মধ্যে এইটাই সব চেয়ে বড় দরগাহা। জওয়ানী বয়েসে অনেক তদবীর করে খোদাতালার পরম করুণায় দশজনের সাহায্যে এই দরগাহা চলে আসছে, এর নামে কিছু জমি-জায়গাও আছে। নবাব-আমীর-ওমরাহরা সব্বাই বৃদ্ধকে খাতির করে, উলেমা বলে মান করে, বড় বড় শীরণীও দেয়। সুতরাং তার এখানে দু'চার দিন কেন দু'চার মাস থাকারও কোন অসুবিধে নেই, তাছাড়া বেওয়া মানুষ, অন্ধ-আতুরকে সাহায্য করাইতো আল্লাহতালার প্রকৃত সেবা করা।

সারাদিনের পথ চলার পরিশ্রমে গুলাবীর ভীষণ ক্লান্তি লাগছিল; ইচ্ছে হচ্ছিল না কথা বলতে। কোমরটা ব্যথায় টনটন করছে, ঘুমে দু' চোখ হয়ে আসছে বন্ধ, তবু সৌজন্যের খাতিরে একবার বৃদ্ধের

সংসারের কথা জানতে চাইল গুলাবী। বৃদ্ধ আবার বলতে লাগলো সংসারের কথা। অল্প বয়েসেই বিয়ে করেছিলেন তিনি, পেশোয়ারী মেয়ে, যেমন রং তেমনি চেহারা, যাকে বলে পাক্কা খুপসুরৎ। বলতে বলতে বুড়োর গলা কেমন ধরে এল বুঝতে পেরে গুলাবী খুশী হয়ে বললো—তারপর ?

—তারপর পেশোয়ারে নেমে এল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। হাজারো মানুষ কাজের অভাবে, খাদ্যের অভাবে মারা যেতে লাগলো। সেই সময় একদিন কাউকে কিছু না বলে বিবির সাথে হাজারো জায়গা ঘুরতে ঘুরতে দিল্লী। কিন্তু কোন ফয়দা হোলনা, ফিন মুশাফির হয়ে এই বাংলাদেশে চলে এলাম বেটি, এক বছর বাদ একটা বেটা পয়দা করে বিবি আমার বেহেস্তে চলে গেল।

—আর সাদী করেন নি ?

—না বেটি, দিল চাইলো না।

—আর বেটা !

—ওকে বড় করলো, মানুষ করলো ওর ফুফু। আপনার নয়, তবু জান দিয়ে দিলওয়ারকে ভালবাসতো ও। এই দরগাহার কাছেই বাড়ী ছিল—সেও নেই।

—এখন বেটা কোথায় ?

—এখন সে আমার বাপ, আর আমি তার বেটা হয়েছি। ও-ই তো এই দরগাহার আসল মালিক—দরবেশ। ওর মত বেটা পাওয়া নসীবের কথা। মস্ত বড় সিপাহী, নবাব ওকে খুব পেয়ার করে—খাতির করে।

সিপাহী শুনে বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো গুলাবীর, আবার কোন বিপদের গর্তে এসে পড়লো নাতো, হয়তো গুলাবীকে দেখে নবাবের কাছে তাকে নিয়ে তুলবে নিজের আখের গোছাতে। মহাভাবনায় পড়ে গেল গুলাবী, তবে কি এই নিবিড় অন্ধকারে আবার পথে বেরুবে ?

বুড়ো তখনো বলে চলেছে তার ছেলের কথা।

—যেমন জওয়ান তেমনি হিম্মৎ, ডর কাকে বলে জানে না।

—সাদী হয়নি ?

—না—বলে, পসন্দই হয় না কাউকে, এই তো আর কিছু বাদ ফিরবে মহল্লা থেকে, যাই বেটি খানা-পিনার ব্যবস্থা করি, তোমারও তো সায়েদ খুব ভুক লেগেছে।

কথা বললোনা গুলাবী, সত্যিই খুব ক্ষুধার্ত সে। বৃদ্ধ বেরিয়ে যেতেই গুলাবী নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। খানিকক্ষণ এলোমেলো ভাবনা ভাবতে ভাবতে গুড়িসুড়ি করে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে হাজির। সযত্নে পরিবেশন করা অতি সাধারণ খানা পরম তৃপ্তি করে খেল গুলাবী' তারপর বৃদ্ধের ব্যবস্থা মতো বিশ্রাম নিলো বিছানায়। সারাদিনের ক্লান্তিতে শুতে না শুতেই তু'চোখ ভরে ঘুম এলো গুলাবীর। দরওয়াজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলো ওসবের কোন বালাই নেই, তবে! মহা তুশ্চিন্তায় পড়লো গুলাবী, হয়তো সারারাত জেগে কাটাতে হবে তাকে, হয়তো বা রাতের অন্ধকারে সিপাহী ছোকরা এসে হাজির হবে তার কাছে। ভাবতেই কেমন অস্বস্তিতে ভরে উঠলো তার মন, তবু বেপরোয়া হয়ে চুপচাপ জেগে রইলো সে। সিপাহীর অশ্বের খুরের শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো নিজের অজান্তেই।

আজ ছুটি।

মৌজ করে আরো কিছুক্ষণ ঘুমাবার ইচ্ছে ছিল সিপাহী দেলোয়ার হোসেনের, কিন্তু আজানের শব্দে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো সে। হাত মুখ ধুয়ে বাইরে বেরোতেই হঠাৎ মনে পড়লো গত রাতের কথা। বাপ বলেছিল, কোন এক বেওয়া নাকি আশ্রয় নিয়েছে এখানে, তু'চার দিন থাকবার অনুমতি প্রার্থনাও করেছে বাপের কাছে। বাইরে বেরুবার আগে একটু বাৎ-চিৎ করে গেলে হয়, হয়তো সরমে আসছে না এদিকে। সাত-পাঁচ ভেবে

এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে বেওয়ার ঘরে গিয়ে হাজির সিপাহী দেলোয়ার হোসেন।

দরওয়াজা খোলা, জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরে, পুরাণো জরাজীর্ণ একটা খাটে অকাতরে ঘুমাচ্ছে দুখী বেওয়া। ঘরে ঢুকতেই অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল দেলোয়ার। এত খুপসুরৎ, এর আগে কোনদিন দেখেনি সে। কোন বেওয়ার এত সুরৎ হতেই পারে না। সবেরার উজালা এসে পড়েছে ওর মুখে-চোখে ওর সারা দেহে, এলোমেলো ঘন কালো চুলগুলি জড়িয়ে রেখেছে ওর কপোল, শরীর থেকে চাদর সরে গিয়েছে, ফুটফুট করছে পা দুটো, ছাতির খানিকটা অংশ উঁকি দিয়েছে বাইরে, নিজেকে কেমন চঞ্চল মনে হোল দেলোয়ার হোসেনের। জেনানাটি যেন তাজা বসরাই গুলাব, দেখেই মালুম হচ্ছে খানদানি, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এখানে এল! দুখী বেওয়াতো হতেই পারে না, বুড়ো বাপকে ফাঁকি দিয়েছে; কিন্তু সিপাহীর চোখকে ফাঁকি দিবার হিম্মৎ লেড়কীর নেই।

এত জায়গায় যুদ্ধে গিয়েছে দেলোয়ার। দোস্ত-বেরাদাররা কত জেনানা নিয়ে হাসি-তামাসা করেছে, দিল্লাগী করেছে, কাজ হাসিল করেছে কিন্তু দেলোয়ার একদম সাচ্চা। দোস্তরা বলেছে দেলোয়ার তুম একদম বাচ্চা, জেনানার স্বাদ পরখ করলি না তো কি করলি! তোর জিন্দগীই বরবাদ হয়ে গেল।

হেসেছে দেলোয়ার, বলেছে—হোক ভাই বরবাদ, তভি আমার দ্বারা ওসব কিছু হবে না। বুড়া বাপের কাছে আমি কসম করেছি ইয়ার।

—ফকির হয়ে যা ফকির, ঝুলিঝাম্পা নিয়ে মক্কা-মদিনা চলে যা, আখেরে কাজ হবে! রসিকতা করেছে বন্ধুর দল তবু দেলোয়ার সিপাহী সাচ্চা ছিল, লেকিন এই মুহূর্তে তার নিজের বাড়ীতে এই বেওয়া দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল দেলোয়ারের, একি কোন ফরিস্তা না হুরী! খোদাতালা কি তাকে পরখ করার জন্য এখানে পাঠিয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেওয়ার সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিল দেলোয়ার হোসেন, হঠাৎ বুড়ো বাপের কথা মনে হওয়াতে পিছু ঘুরতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলো গুলাবী, দেখা মাত্রই বুঝলো এই সেই সিপাহী দেলোয়ার হোসেন। দেলোয়ার অত্যন্ত সংকোচে বিনয়ের সাথে বললো—মাফ করবেন, বুঝতে পারিনি আপনি এঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

গুলাবী অভিবাদন জানিয়ে বললো—না, না, একি বলছেন আপনি, আপনাদের আশ্রয়েই তো আছি।

—বলেন কি আমাদের আশ্রয়! এটা তো খোদাহ্‌তালার মোকান, এখানে আপনার আমার সবার সমান অধিকার। আচ্ছা আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসুন, পরে আলাপ করবো—কেমন!

গুলাবী সর্ব্বাঙ্গে চাদর ঢাকা দিয়ে বিছানায় বসে বসে দেলোয়ারের সাথে কথা বলছিল, ও বাইরে বেরুতেই পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক করে বাইরে আসতেই বৃদ্ধ খাবার ব্যবস্থা করায় কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো গুলাবী, বললো—আপনি কেন এত কষ্ট করছেন, আমাকে বলুন না কি করতে হবে? দেলোয়ার হাসি মুখে এসে বললো—তা নয়, কাজ করবার লোক আছে এখানে, কিন্তু বাবা বোধ হয় আপনাকে ভালবেসে ফেলেছে তাই নিজের হাতেই সব কিছু করতে চায়।

হাসলো গুলাবী, অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হোল সিপাহী দেলোয়ার হোসেনের সাথে, ইকবালের সেনাবাহিনীর সে একজন সর্দ্দার। কথা বলতে বলতে দেলোয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছিল ইকবালের, ওর মত শাসনকর্তা এ অঞ্চলে আর একটিও নেই, নবাব শাহান শা আলীমর্দ্দান পর্যন্ত খাতির করে চলে ইকবালকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সব কথা শোনার পর মৃদু হেসে গুলাবী বললো—আমি গরীব মেয়েমানুষ, ওসব নবাব-বাদশার ব্যাপার আমি আর কি বুঝবো! তবে একটা কথা বুঝতে পারি যে আপনার ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল।

—কি করে বুঝলেন ?

—আপনার কথাবার্তায়, চালচলনে, সাহসে, বীর্যবত্তায়। কথা শুনে খুশী হোল দেলোয়ার হোসেন, তারপর বললো—এখানে থেকে যাননা কয়েকটা দিন, আপনার কোন অসুবিধে হবে না এখানে।

—আমি গরীব বেওয়া, এই খোদার আসরে থেকে কি করবো ?

—কুটুম বাড়ী এলেও তো মানুষ দু'একটা দিন বেড়িয়ে যায়, আপনিও না হয় সেরকম কয়েকটা দিন থেকে গেলেন।

মিষ্টি হেসে সম্মতি জানালো গুলাবী।

দেলোয়ার হোসেনের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখছিল সারা চত্বরটা গুলাবী বিবি, মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এখানকার পরিবেশ বুঝতে চেষ্টা করছিল সে। বিরাট জায়গা জুড়ে এই দরগাহা, এক পাশে ছোট্ট একটা পুকুর, ছোট্ট একটা মসজিদ আর তার সামনে ফকির দরবেশ অতিথিদের বিশ্রাম নেবার জায়গা। সামনে বিরাট ফুলের বাগান। রং, বেরং ফুলের বাহারে খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা। পেছনে দেলোয়ারদের থাকার জায়গা। মোটামুটি সুন্দর ছিনছাম্ করে সাজানো পাঁচ-ছটি ঘর সব মিলিয়ে, বাপ্-বেটা, বাঁদী খানসামা নিয়ে সব মিলিয়ে ছ'সাতটি প্রাণীর বাস এখানে। বৃদ্ধ দরবেশের খুব মান-খাতির এখানে, তারপর দেলোয়ার হোসেন অল্প বয়সে সেপাহী সর্দ্দার হওয়ার ফলে এ এলাকার লোক নবাবের মত খাতির করে তাকে। খুব খুশীয়ালীর সংসার।

দেলোয়ারের সাথে কথা বলে মনে হোল সে খুব শক্ত প্রকৃতির মানুষ, অবান্তর কথা বলতে ভালবাসেনা, প্রভু ইকবালের প্রতি খুব বিশ্বাস। দেখতে যেমন সুপুরুষ তেমনি মুখ-চোখের দীপ্তি। গুলাবীর বেশ লাগলো দেলোয়ারকে, হয়তো একে দিয়ে অনেক কাজ করানো যেতে পারে, এমন কি মনের আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হওয়া বিচিত্র নয়, তবু আরো কয়েকটা দিন বাজিয়ে দেখা দরকার। গুলাবীর মনে হোল

নিজের সঠিক পরিচয় দিলে দেলোয়ার হয়তো ইতস্ততঃ করবে, তার চেয়ে ছদ্মবেশে থাকাই বিচক্ষণের কাজ।

কথা প্রসঙ্গে দেলোয়ার জানতে চাইলো, গুলাবীর পরিচয় আর সত্যি সে বেওয়া কিনা, প্রশ্নের ধরনে মনে হোল সে গুলাবীর কোন কথাই বিশ্বাস করেনি, তার মনের সন্দেহ নিরসন করার উদ্দেশ্যে বানিয়ে বলা ছাড়া আর কোন পথই রইল না গুলাবীর। এ-ভাবে কাটলো কয়েকটা দিন। বৃদ্ধকে সেবা যত্ন করে খুশী করতে চেষ্টা করে গুলাবী। দেলোয়ারের সাথেও কথা বলে খোলা মনে, অন্যান্য বাঁদী-খানসামার চোখে বড় দৃষ্টিকটু লাগে গুলাবীর আচরণ, কিন্তু সাহস পায়না কিছু বলতে। দেলোয়ার হোসেন যেন আরো বেশী ঘনিষ্ঠ হতে চায় গুলাবীর সাথে আন্তরিকতার সুরে কথা বলে সর্ব্বক্ষণ।

গুলাবীর বুঝতে অসুবিধে হয়না যে দেলোয়ার তার রূপের টোপ গিলতে শুরু করেছে, এখন ধীরে ধীরে, তারপর একসময় পুরো ফাংনা ধরে টান পড়লেই অনেক খেলিয়ে তবে ডাঙ্গায় তোলার কাজ।

দেলোয়ার বলছিল—আপনি যদি সাচ্চা পরিচয়টা দিতেন তবে আপনাকে ভারি মজার গল্প বলতে পারতাম, কিন্তু আপনাকে ঠিক-মত না জানা পর্যন্ত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

—কেন আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি বিশ্বাসের অযোগ্যা?

—না, ঠিক তা নয়, তবে আমিও তো একজন সর্দ্দার, রাজ্যের অনেক গোপনীয়তা আমাদের রাখতে হয়।

—বেশ তো, বলবেন না কিছু। অভিমানের ভান করে গুলাবী, তারপর ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—বিদেশ বিভূঁয়ে আমাকে দেখার যখন কেউ নেই, তখন আমাকে কেই বা বিশ্বাস করবে বলুন?

গুলাবীর আচরণে হকচকিয়ে যায় দেলোয়ার, তারপর ধীর কণ্ঠে বলে—ব্যাপার কি জানেন, গত দু'তিন দিন যাবৎ এক খুপসুরৎ ছুকরির খোঁজ করছি, তামাম বাড়ী-বাড়ী মহল্লা-মহল্লায় ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে

হায়রান হয়ে গেলাম, কিন্তু সেই চিড়িয়ার পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না—ভাবছি ছুকরিটাকে পেলে একটা ভাল দাঁও মারা যেত, কিন্তু তকদীরেই নেই, কি আর হবে।

—কি আর হবে, আমি খুপসুরৎ হলে না হয় আমাকে নিয়ে তকদীর ফেরাতে পারতেন, কিন্তু সে রূপ যখন নেই, তখন খুঁজতে থাকুন সেই জেনানাকে—যদি খোঁজ মেলে।

কথা শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে দেলোয়ার হোসেন, তারপর বলে—আমার ধারণা সেই খুবসুরৎ জেনানাও আপনাকে দেখলে শরমে মরে যাবে।

—তাই নাকি ?

এবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো গুলাবী, তারপর বললো—আচ্ছা আপনার সাথে আমি যে এত খোলামেলা কথাবার্তা বলি, এতে আপনার বাবা কিংবা অন্যে কিছু ভাববে নাতো ?

—ভাবা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সিপাহী দেলোয়ারের কাজের সমালোচনা করে, এমন লোক এখানে নেই। কারণ সকলের ঘাড়েই তো একটা মাথা।

—তাই বুঝি, গুলাবী চোখ পাকিয়ে হেসে ওঠে।

ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠতর হয় সিপাহী দেলোয়ার হোসেন, রূপের জৌলুশে মুগ্ধ হয়ে বলে—আমি তোমাকে চিরদিনের মত পেতে চাই, আমার এই তৃষিত দিল্—এতে তোমাকে বসাতে চাই বিবি।

—কিন্তু তুমি আমাকে কতটুকু জান দেলোয়ার, শুধু চোখের চমকে যদি আমাকে ভালবাস, তবে তো সারা জিন্দগী ভালবাসতে পারবে না, পুরাণা হলেই নয়ার সন্ধান করবে—তাই না !

—না-না, আমি তোমাকে জীবনভোর ভালবাসবো, তোমাকে পেয়ার করবো, আমি তো বলেছি—আমি তোমার কিছু জানতে চাই না, অতীত আমার কাছে মৃত ও-নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাটি করতে চাইনা, শুধু বল তুমি আমাকে সাদী করতে রাজী কিনা ?

উত্তরের আশায় চঞ্চল হয়ে উঠলো দেলোয়ার। গুলাবী বুঝেছে,

দেলোয়ার ইস্পাতের টুকরো, এতে মরচে পড়বে না, বরং তীক্ষ্ণ ধার দিয়ে কাজে লাগানো যাবে, কিন্তু একটা নাম তো দরকার, সেই কৈশোরে বাপ-মা'র দেয়া নাম কবে যৌবনের শুরুতেই মুছে গিয়ে হয়েছিল গুলাবী, আর এখন! মুহূর্তে নাম স্থির করে ফেললো গুলাবী, মা'র মুখে শুনেছিল ও জন্মাবার আগে নাকি আরেকটি বহিন হয়েছিল ওর, সেও বেশীদিন বাঁচেনি, কিন্তু দেখতে ছিল নাকি সাক্ষাৎ হুরী, সওখ করে মৌলভী সাহেব নাম দিয়েছিল আখতার নার্গিশ। সেই স্মৃতিই না হয় ওর নামেই বিজড়িত থাক। সারা জীবনই তো মিথ্যে আর ভুলের বোঝা বয়ে বয়ে জীবনটাকে নিরর্থক করে ফেলেছে সে, সেই মিথ্যের সাথে এ নামটাও না হয় আরেকটা নতুন সংযোজন।

দেলোয়ারের দিকে খুব মিষ্টি করে হাসলো গুলাবী, বললো, তুমি কি এক্ষুণি এই মুহূর্তে আমার কাছে তোমার প্রশ্নের জবাব চাও?

—কেন, তুমি কি তা বুঝতে পারছ না?

—বেশ তো, আমারও আপত্তি নেই, তবে এ কয়দিন তোমাদের কাছে এসেছি, কই নাম ঠিকানাতো জানতে চাওনি।

—অধিকার না বর্তালে কি করে চাইবো।

—বেশ সুন্দর করে কথা বলতে পার তো তুমি।

—সুন্দরের কাছে এসেছি বলেই হয়তো কথা বেরুচ্ছে।

খুশীতে মজবুর হয়ে এই প্রথম দেলোয়ারের দিকে হাত বাড়াল গুলাবী, বললো—আমি তোমার বেগম আখতার নার্গিশ।

পরম পরিতৃপ্তিতে সমস্ত পৌরুষ দিয়ে নার্গিশকে বুকের কাছে টেনে নিল সিপাহী সর্দ্দার তরুণ দেলোয়ার হোসেন।

নার্গিশের নতুন জীবন শুরু হয়েছে।

অনেক আমীর-ওমরাহ নেড়েচেড়ে আলীমর্দ্দানের আখড়া ঘুরে মুবারকের সাথে ঘর করে এবার সিপাহী সর্দ্দারের বেগম। পাথরের

ঘুড়ির মত গড়ানো জীবন আর ভাল লাগে না। এবার স্থায়িত্ব দরকার।

দেলোয়ার তার বেগমকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। খুব হৈ চৈ করেনি একটা, শুধু কিছু ইয়ার-দোস্ত আর পাড়া-পড়শী দাওয়াৎ পেয়েছিল। দোস্তরা বলেছে—সাব্বাস্ দেলোয়ার, তোর তকদীর আছে, তদবীর না করেই সাচ্চা মোহর মিলে গেল তোর। খুশী হয়েছে দেলোয়ার, সারা রাত ধরে গল্প করেছে বেগম নার্গিশের সাথে, জীবনের সঞ্চিত গোপন কথার মালা সমস্ত উজাড় করে দিয়েছে তার কাছে—সব চেয়ে খুশী হয়েছে দেলোয়ার, যখন জেনেছে তার বেগম বেওয়া নয়, এই তার প্রথম সাদী।

নার্গিশও খুব খুশী হয়েছে দেলোয়ারকে পেয়ে, কিন্তু সব সময় যেন একটা অজানা আতঙ্ক ওকে জবুথবু করে রাখে। কি জানি কখন বুঝিবা ফাঁস হয়ে যায়, যে সে মুবারকের বেগম হয়েছিল, তা হোলেই সর্ব্বনাশ। হয়তো বা দেলোয়ারের সমস্ত আশা নষ্ট হয়ে গেলে খুনই করে ফেলবে তাকে, হাজার চেষ্টাতেও আতঙ্ক দূর করতে পারছে না নার্গিশ। দেলোয়ার আর আগের মত রাজধানীতে রাত কাটায় না। রোজ বাড়ী ফিরে এসে নবাব-বাদশার নিত্য নূতন খবর শোনায়। শুনিয়ে তৃপ্তি পায়। কবে কোথায় ইকবাল ওকে খাতির করে কথা বলেছে, ইনাম দিয়েছে, সব বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মনে মনে হাসে নার্গিশ, তরুণ যুবার আত্মপ্রশংসা শুনতে ভালই লাগে তার।

হঠাৎ কাজ থেকে ফিরে একটা নতুন খবর শোনালো দেলোয়ার। ইকবাল যার খোঁজ করছিল সেই মুবারকের বেগমের খোঁজ নাকি মিলেছে, দারুণ খুপসুরৎ ছিল সেই জেনানা, মুবারক মারা যাবার পর সেই রাত্রেই নাকি জহর খেয়ে জান কুরবাণী করেছিল সে। বেফাজুল অনেকগুলো সিপাহী ওকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হোল এদ্দিন। জেনানাটা একদম বুদ্ধু ছিল, তা-না হোলে জান কোরবাণী করে!

দেলোয়ারের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে

রইলো বেগম আখতার নার্গিশ। তারপর অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে শুধালো—কোথায় পাওয়া গেল সেই জেনানাকে ?

—শুনলাম মহলার কাছেই কোথায় যেন ওর লাশ মিলেছে, সিপাহীরা ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, ঐ সেই খুপসুরৎ জেনানা।

—যাক্ তাহলে তো তোমাদের আর কোন ঝঞ্ঝাটই রইলো না, কি বলো !

—কি জানি নবাব-বাদশার মর্জ্জি, তবে মালুম হচ্ছে কি নবাব আর এই সব ব্যাপারে বেশী মাথা ঘামাবেন না।

—না ঘামালেই ভাল।

কথাটা বলেই হেসে উঠলো বেগম আখতার। দেলোয়ার অবাক হয়ে শুধালো—কি ব্যাপার বেগম, তুমি হাসলে কেন ?

—এমনি।

—কভি নেহি, কারণ ছাড়া তো তোমার মুখে হাসি দেখিনি।

—তাহোলে জরুর কোন কারণ আছে।

—কি আমাকে বলবে না ?

—তেমন কিছুই না, ভাবছি তোমার নবাব সাহেব সেই জেনানার দুঃখ মেটাতে হয়তো আরও কিছু জেনানার খুপসুরৎ পরীক্ষা করবেন, তারপর সবারি সেই এক রকম অবস্থা হবে—তাই না !

—না, না বেগম, নবাব ইকবাল সেরকম নয়, ওর দিলের খবর তুমি জান না বলে ওর নামে বদনাম দিচ্ছ, শুনে রাখ, লাখো নবাবের মাঝে ও একটা খান্দানী নবাব। মুবারকের মত হিংস্র ও নয়।

কথাটা বেগম আখতারের হৃদয়ে যেন প্রচণ্ড ঘা দিল। আখতার বললো—তুমিই বা না জেনে মৃত নবাবের নামে ও কথা বলছ কেন ! জান না মৃত মানুষের নামে দোষ গাইতে নেই, তাহলে তার গুনাহ্ হয়।

কোন কথার প্রতিবাদ করলো না দেলোয়ার, শুধু বেগম আখতারের মুখের দিকে তাকিয়ে আবেগে ওকে কাছে টানতে চাইলো।

নবাব আলীমর্দ্দানের ফরমান পেয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে নবাব ইকবাল। তার জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে নবাবগঞ্জ শহর, নতুন শাসনকর্তা নবাব ইকবাল মনের মত করে সাজিয়ে একবার শাহান শা আলীমর্দ্দানকে এখানে এনে খুব জোর সম্বর্দ্ধনা দেবার বাসনা করছিলেন মনে মনে, কিন্তু এত তড়ি-ঘড়ি তো হওয়া সম্ভব নয়, তাছাড়া নবাব সাহেবের জন্য কিছু আচ্ছা চিজ তো দরকার। বেওকুফ সিপাহীগুলো কোন কাজের নয়, শুধু রাস্তা-ঘাট সাফা করলেই তো শাহানশাকে খুশী করানো যাবে না—তার জন্য চাই নজরানা।

পেয়াস বাড়ী থেকে নবাবগঞ্জের দূরত্ব অনেকখানি। এত দূর থেকে বার বার এসে নজর রাখাও বিস্তর ঝামেলা, তার চেয়ে যদি কোন বিশ্বাসী লোক মিলতো তবে না হয় হর হপ্তা এসে দেখা-শোনা করে যেতেন। পেয়াস বাড়ীর বিশ্বাসভাজন লোকদের নাম স্মরণ করতে লাগলেন তিনি, কিন্তু মনের মত কাউকে পাওয়া গেল না।

দুনিয়াটাই শালা বেইমানীর জায়গা। তামাম জায়গায় সুযোগ-সন্ধানীরা ওৎ পেতে রয়েছে, একটু বেসামাল হয়েছ কি ব্যস্ অমনি কোতল করবে, ছিনিয়ে নেবে কিছু, কাউকে যদি দয়া দেখাও, সেটা হয়ে দাঁড়াবে ওর ন্যায্য অধিকাব। জুলুম-জবরদস্তি করে অধিকার কায়েম করার জন্য ওই হয়ে দাঁড়াবে পয়লা নম্বরের দুশমন। আবার যদি কাউকে এখানে না রাখা যায়, তবে এখানকার প্রজাগুলো আবার ভিতরে ভিতরে বদমাশ হয়ে উঠবে। হুকুম মানবে না—সেলাম করবে না।

এই জায়গাকে খারাপ করার জন্য মুবারককেই দায়ী করতে ইচ্ছে হোল ইকবালের। মুবারকই আস্কারা দিয়ে দিয়ে মানুষগুলোকে বেইমান করে তুলেছে, তাছাড়া এখানে কিছু খান্দানী কাফের আছে বলেও খবর এসেছে তার কাছে। কাফেরকে বিলকুল বিশ্বাস নেই, ওদের মাথায় বুদ্ধিটা খেলে ভাল, কখন কোন্ প্যাঁচে নাস্তানাবুদ করবে তার তো ঠিক নেই। নয়া নবাব ইকবাল আরেকবার পরিচিত মুখগুলো স্মরণ করতে লাগলেন। নয়া নবাবের জৌলুশ আর খুশীয়ালীতেই কেটে গেল এক হপ্তা। এখানকার প্রজা এই ক'দিনেই ভুলে গেল পুরানা নবাবের নাম। শুধু দূর-দূরান্তের গ্রামের মানুষগুলোর মনে সেই ভয়াবহ অত্যাচারের ঘটনাগুলো নূতন করে মনে হোল—কি জানি এই নবাব আবার আগের মত হবে নাতো!

নবাব মুজাফ্ফর ইকবাল খবর পেয়েছিল যে ভাতিন্দা, ঘোড়াঘাট চিনির বন্দর এলাকার মানুষগুলো একবার নবাব মীর মুবারকের বিরুদ্ধে গর্জ্জে উঠেছিল—বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল নাকি! এমন কি একবার লক্ষ্ণৌতের শাহান শা আলীমর্দ্দানের দরবারে এ ব্যাপারে আর্জ্জিও পেশ করেছিল। সেই আগুনের ফুল্‌কী এখনো সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিনা কে জানে! তামাম মুল্লুকটা একবার ঘুরে দেখা দরকার, এখানকার মানুষগুলোর চরিত্র সম্পর্কেও খানিকটা আঁচ করা প্রয়োজন।

নবাব দরবারে মহফিলের আয়োজন হোল। এলাকার তামাম ওমরাহ, সর্দ্দার, খান্দানী আদমীরা এসে কুর্নিশ জানালেন নয়া নবাব মুজাফ্ফর ইকবালকে। খুব ভাল করে সবার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি—নাঃ, কারো চোখে তেমন বেইমানীর আগুন পেলেন না। তবে কি এখানকার মানুষগুলো সব সাচ্চা হয়ে গেল!

রাতভোর নাচ গানের মহফিল হোল নবাব দরবারে। খুশীয়ালীর আমেজে নেশায় বিভোর ওমরাহরা, নবাবের প্রশংসায় মুখর হয়ে

উঠলো সব্বাই। ঢুলু ঢুলু আঁখে বাঈজীর কাছে নিজেদের বিলিয়ে ওমরাহরা বুঁদ হয়ে রইলেন।

নবাব ইকবাল পরখ করলো সব্বাইকে, বিলকুল ভূষি মাল. বাঈজী আর সুরায় এই সব অপদার্থগুলোকে সহজেই কেনা যায়। এদের দিয়ে রাজ্য শাসন করা যায় না, তিনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেগম মহলে হাজির হলেন নতুন মিষ্টি মুখের সন্ধানে।

আলী গওহর এসে হাজির। পেয়াস বাড়ীর নবাব মুজাফ্‌ফর ইকবাল তখন হারেমে নারীদের রূপচর্চ্চায় ব্যস্ত। সেই কবে আশমানতারার ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় অত্যাচারী মুবারকের ভয়ে ভয়ে আত্ম গোপন করেছিল আলী গওহর, এবার মুবারক আর আশমানতারা ছু'জনেই খতম, ব্যস এবারে পুরানো দোস্ত ইকবালের সাথে মুলাকাৎ করতে দোষ কি!

বাইরের মহলে বসে বসে ঝিমুনি আসছিল আলী গওহরের, হঠাৎ খবর এলো নবাব সাহেব অন্দর থেকে বেরুচ্ছেন। আলী গওহরের মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিল, ইকবাল চিনবে তো! এখন তো ছু' ছুটো জায়গার শাসনকর্ত্তা নবাব, সেই অতীতের কথা কি মনে আছে!

নবাব মুজফ্‌ফর ইকবালকে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই খুশীতে হাত মিলালেন তিনি গওহরের সাথে, বললেন—আরে আলী সাহেব, কি খবর তোমার? আমি তো ভাবলুম, তোমার জিন্দগীর ইস্তক বিস্তি কাবার, তা-না হোলে কেউ এতদিন বেপাত্তা হয়ে থাকতে পারে!

গওহর বুঝলো ইকবাল তাকে ভোলেনি, মেজাজ শরীফ মনে করে উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বলে বসলো—নবাব সাহেব, এদ্দিন পালিয়ে বেড়ালাম তো আপনার জন্য, এবার যদি মেহেরবাণী করেন তো আপনার আশ্রয়ে নূতন করে বাঁচবার চেষ্টা করি।

—বেশতো, বলনা তোমার জন্য কি করতে পারি।

—আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন, তবে আর ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগেনা, এবার আস্তানার দরকার।

—কেন সাদী-টাদি করেছ নাকি ?

—না নবাব সাহেব, হয়ে ওঠেনি—তকদীরে নাই।

—যেটা তকদীরে নেই আলী, সেটাকে তদবীর দিয়ে করতে হবে ইয়ার। কোন কথা বললো না আলী, মনের পর্দ্দায় কে যেন খলিদা বান্নুর কথা মনে করিয়ে দিতেই বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। এই মুহূর্ত্তে নিজেকে নিজের কাছেই খুব ছোট মনে হোল তাঁর, ইকবাল দু'চার দিন বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলো আলীকে, বললো, অনেক জরুরী সল্লা পরামর্শ আছে তার সাথে।

অনেক দিন পর পরম নিশ্চিন্তে গুলাবীনেশায় ঠোঁট ভেজাল আলী গওহর।

সিপাহী সর্দ্দার আলী গওহরকে অনেক পুরাণা জামানার কথা স্মরণ করিয়ে আসল কথা বললো ইকবাল,—তুমি আমার জন্য যা করেছ তা আমার ইয়াদ আছে, আমার বিশ্বাস তুমি এখনো আমার সাথে বেইমানী করবে না, তাই না ?

—জরুর। মাথা নেড়ে সায় জানালো আলী গওহর।

—আচ্ছা তোমাকে যদি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ দি—পারবে ?

—কেন পারবো না নবাব।

—না, নবাব নয়, তুমি আমার দোস্ত, পুরাণা ইয়ার, আর সেই দাবীতেই তোমাকে আমার নয়া মুল্লুকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই গওহর।

—আমার জান কবুল করে আপনার হুকুম তামিল করবো নবাব, খোদার কসম কেটে বল্লাম।

—বেশ, তাহলে আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমিই নবাবগঞ্জের শাসনভার গ্রহণ কর। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে কিংবা মাসে দু'চার

বার করে এসে তোমাদের দেখা দিয়ে যাবো। মনে রেখো আলী, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, জেনানা নিয়ে ফূর্ত্তিতে মশগুল থাকলে কোন সময় দেখবে, নোকরি নেই—তুমিও নেই, বুঝেছ ?

—জী জনাব, আমি আপনার হুকুমের এক কদম নড়চড় করবো না, আপনি এলে আপনার খিদমতের কোন কসুর হবে না নবাব সাহেব।

—খুব ভাল কথা, তবে তুমি তো সব জানো, মুবারকের মত বেইমানকে পর্যন্ত শায়েস্তা করতে আমি ছাড়িনি। তোমার যদি কোন তকলিফ হয় আমাকে জানাবে, লেকিন দুশমনদের সাথে কভি হাত মিলাবে না।

—জী, না নবাব সাহেব, পবিত্র কোরাণের নাম উচ্চারণ করে বলছি, ওসব কাজ আমার দ্বারা হবে না।

—তোমার এত কসম কাটার ছড়াছড়ি কেন আলী সাহেব, আমি ওসব খোদা আর কুরাণে বিশ্বাস খুব কমই করি—আমার বিশ্বাস মানুষকে। মরা মানুষকে বিশ্বাস করাই সব চাইতে নিরাপদ, তবে মাঝে মাঝে জিন্দা মানুষকেও বিশ্বাস করতে হয়। যেমন তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি।

—জী জনাব।

—আচ্ছা আমি তাহলে তোমাকে এখানকার সব দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েই পেয়াস বাড়ী ফিরে যাবো। ওখান থেকে অনেক দিন হল বেরিয়েছি—মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। তুমি এখন বিশ্রাম কর, সময় মতো আমি তোমাকে ডেকে আনবো।

—জী জাঁহাপনা।

আলী গওহর ইকবালের সম্মুখ থেকে বেরিয়ে বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলো। বলে কি ইকবাল। তাকে নাকি দেবে এই বিরাট নবাবগঞ্জ মুল্লুকের দায়-দায়িত্ব। আল্লা পরম করুণাময়, তা না হোলে প্রাণভয়ে ভীত সিপাহীর ভাগ্যে এরকম মওকা আসে। একেই না বলে আল্লা, যব দেতা হ্যায় তো ছপ্পর

ফোড়কে দেতা হ্যায়। খুশীতে একা একাই হেসে উঠলো আলী গওহর। জীবনে এমন ভাল খুশ খবর আর কোনদিন শোনেনি সে। ইচ্ছে করছিল ইকবালের পা দুটো জড়িয়ে বলে, বহুৎ মেহেরবানী ইকবাল, তুমি আমার তকদীর ফিরিয়ে দিয়েছ, উফ্ এই সময়ে যদি খলিদা বানু পাশে থাকতো, তবে কি খুশীই না হতো সে, বরাতে নেই তাই ভোগে লাগলো না। এই ইকবাল কমবক্তটার জন্যেই যত্ত ঝামেলা। আর চুপ করে রাত-বিরাতে দিলজান বিবির সাথে মহব্বত করার দরকার নেই, এখন সাফ সাফ দেন মোহরের কথা বলতে হবে, এখনও যদি ওর বাপ সাদী দিতে না চায় তো শালা একেবারে জান খতম করে ওর বেটিকে লিয়ে আসবো। নবাবগঞ্জের বাদশা আলী গওহরকে বেটি দিবে না এত বড় হিম্মৎ হবে ছোট্ট রিসলদারের!

দু'চোখ বন্ধ করে কল্পনার আবেশে বিভোর হয়ে রইলো আলী গওহর, মনে মনে গুন্ গুম্ করে উঠলো—

খোদা তোমার মেহেরবানী
খোদা তোমার মেহেরবানী,
আশমানেতে চাঁন্দ দিয়াছ
সমুদ্দুরে পানী
খোদা তোমার মেহেরবানী।

আজ সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা। আকাশে পেঁজা তুলোর মত ছড়ানো ছিটানো মেঘ খণ্ড উদাস হয়ে ছুটোছুটি করছে। শরতের আকাশ। চারদিকে কেমন মন্দ মধুর হাওয়া।

প্রকৃতির এই মিষ্টি পরিবেশ খুব ভাল লাগছিল সিপাহী সর্দ্দার দেলোয়ার হোসেনের। কথা ছিল আজকেই কাফেরদের কতগুলো গ্রাম চক্কর দিয়ে আসবে, বুঝে আসবে অবস্থাটা, কিন্তু ভাল লাগছিল না যেতে। ঘোড়াটাও যেন মনের কথা বুঝতে পেরে দুলকি চালে

না চলে গা ভাসিয়ে দিয়েছে আপন খেয়ালে, হাঁটি-হাঁটি পা-পা অবস্থা।

ঘোড়ার গতিপথ ঘুরিয়ে দিল দেলোয়ার। এবার সোজা মিলকী মোহনপুরের কথা, সেখানে ওর জন্য অপেক্ষায় আছে রাজকন্যে আখতার নার্গিশ। আজ এত তাড়াতাড়ি ওকে ফিরতে দেখে খুশীতে ভরে উঠবে ওর মুখ, কাছে এসে উৎফুল্ল হয়ে স্বাগত জানাবে : তারপর দু'জনে মুক্ত আকাশের নীচে চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি দেখবে প্রাণভরে।

মাঝে মাঝে দেলোয়ারের মনে হয় এই সিপাহী জীবন কেমন যেন রূঢ়তা আর নিষ্ঠুরতার মোড়কে জড়ানো। তার চেয়ে এই পৃথিবীর ধূলি-কণা, খোদাহতালার অপূর্ব সৃষ্টি গাছ-পালা নদী পর্ব্বত এই সব দেখে আর ভালবেসে যদি জীবনটা কাটানো যেতো, তবে না জানি কি সুখই ছিল। ঠিকই বলে বেগম আখতার, আমাকে নাকি সিপাহীর পোষাক মানায় না, তার চেয়ে গিলেকরা চুড়িদার পাঞ্জাবী আর পাজামাই নাকি ভাল। আমি ফুল লতা-পাতা ভালবাসি, নদীর ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি, চাঁদের আলো উপভোগ করি, তাই কি ও আমায় রসিকতা করে। কিন্তু ওতো জানে না আমাদের আদি পুরুষ ফকিরের বংশ, ফকিরীই ছিল আমাদের আদি ব্যবসা। দেশের অবস্থার বিবর্তনে আজকাল আমরা হয়েছি সর্দার, কেউ বা সিপাহী, আবার কেউ বা কোথাও পেয়েছে মনসবদারী। কিন্তু হলে কি হবে, যার খুনে ফকিরীর নেশা সে কি এত সহজে এ জিনিস ছাড়তে পারে!

ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে চলেছে দেলোয়ার, শেষ সূর্য্যের বেলা, তামাম আশমান থেকে গলে গলে পড়ছে সোনা রং, দুনিয়াটাকে দেখাচ্ছে যেন সোনার পাতে মোড়া আজব চীজ। এই সুন্দর মিষ্টি সময়ে আখতার বেগমকে কি সুন্দরই না লাগতো, দেলোয়ার খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ওর নিজ মহলার দিকে।

লক্ষৌতির নবাব আলীমর্দ্দান এই সবে নবাব শাহান শা

কুতুবুদ্দিনের কাছ থেকে সেলাম জানিয়ে ফিরতেই মহালে এসে শুনলেন—কাণা ঘুষা চাপা বিদ্রোহ নাকি জোট পাকাচ্ছে তার বিরুদ্ধে। প্রজাদের উস্কিয়ে কিছু কিছু খান্দানী ওমরাহ নাকি মদৎ জোগাচ্ছেন। সব শেষে তাজ্জব লাগলো নবাব সাহেবের যে—সামসী, নিমসরাই, বিজল বাড়ীর ওমরাহরা নাকি বুলবুল চণ্ডী এলাকার কাফের ছোকরা রুদ্র প্রসাদকে পর্যন্ত উস্কে দিয়ে তামাম মুলুকে দল পাকাচ্ছে অথচ বুদ্ধু ইকবাল কোন খবরই রাখে না, ছোকরা নিজের মৌজেই আছে। এদিকে দুনিয়াদারী যে খতম হতে বসেছে তার কোন হুঁশ নেই।

উত্তেজিত শাহানশা আলীমর্দ্দান এত্তেলা পাঠালেন সমস্ত ওমরাহদের কাছে, আর আলাদাভাবে ডাকলেন ইকবালকে। এত্তেলা পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে এলেন পেয়াস বাড়ীর শাসনকর্ত্তা। ইকবাল, কুর্নিশ জানিয়ে বললেন—শাহানশা, বান্দা হাজির।

—বেওকুফ্ রাজ্য শাসনের পক্ষে তুমি অযোগ্য অপদার্থ।

—আমার কি কসুর জাঁহাপনা!

—কসুর? সরম হচ্ছে না, আমার কাছ থেকে তোমার কসুর জানতে চাইছ, উত্তেজিত নবাব পায়চারী করতে করতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন মাঝে মাঝে, এক সময় ইকবালের দিকে স্বক্রোধে বললেন, তুমি কি জানো, এলাকায় ওমরাহরা বিদ্রোহ করার জন্য সল্লা পরামর্শ করছে। তুমি কি ঘুমাচ্ছিলে, না জেনানাদের নিয়ে মৌজ করছিলে বেতমিজ কাঁহাকা, রাগে থর থর কাঁপছিলেন শাহানশা। তিনি ভুলে গেলেন যে, একজন শাসনকর্ত্তার সাথে কথা বলছেন। ক্রোধে অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল ইকবালের, অনেক কষ্টে অসীম ধৈর্য্যে নবাবের কটূক্তির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

অনেকক্ষণ পর নবাব আলীমর্দ্দান বললেন—যাও, ঘোড়াঘাট, ভাতিন্দা আর পাণ্ডুয়ার দিকে কড়া নজর রেখো, বুলবুল চণ্ডীর কাফের ছোকরার খবর আমি নিচ্ছি, সব সময় কিছু সিপাহী তৈয়ার রেখো। আর মাঝে মাঝে নিজে টহল দিয়ে এলাকাকে গরম করে

রেখো। বেশী মিলাদ মহফিল না হয়, কিংবা ওমরাহদের বাড়ীতে সাদী, আখিকার ব্যবস্থা হলে সেয়ানা গুপ্তচর রাখবে যেন সব খবর তুরন্ত পেয়ে যাও, জরুরৎ হলে আমাকেও জানাবে, কাউকে বিশ্বাস করবে না একদম। কুর্নিশ জানিয়ে মাথা নীচু করে আলীমর্দ্দানের সম্মুখ থেকে বেরিয়ে এলো পেয়াস বাড়ীর নবাব মুজাফ্‌ফর ইকবাল হোসেন।

অনেক দিন পর নবাব শাহানসা আলীমর্দ্দানের এত্তেলা পেয়ে তামাম এলাকার আমীর ওমরাহ, গাজী সাহেব ও খান্দানী উজীররা জমায়েত হয়েছেন লক্ষৌতির দরবারে। বিচিত্র বর্ণাঢ্য পোষাকে বিভিন্ন উপঢৌকন সহ এসেছেন সব্বাই। অজানা আতঙ্কের আশঙ্কা করছিলেন তাঁরা, কি জানি কোন খোয়াব দেখেছেন নবাব, কি হুকুম করে বসেন তার তো ঠিক নেই!

নবাব দরওয়াজায় বাহারি গুলাবের মেলা। শৌখীন করে সাজানো হয়েছে নবাবের হাওয়া মহল, ঝকঝকে পোষাকে রাজধানী পাহারা দিচ্ছে সিপাহীর দল, যেন হুকুম পেলেই মাথাটা খসিয়ে ফেলতে পারে যে কোন কাউকে।

নবাব শাহানসা মালিক আলীমর্দ্দান গুরু গম্ভীর পদশব্দে প্রবেশ করলেন দরবারে। ওমরাহবৃন্দ সসম্মানে সেলাম জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। নবাব খুব ভাল করে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন—আমি গতকাল দিল্লীর বাদশার সাথে মুলাকাৎ করে লক্ষৌতিতে এসে অনেকগুলো খারাপ খবর শুনে আপনাদের সাথে কিছু সল্লা-পরামর্শ করবার জন্যই আপনাদের খবর পাঠিয়েছি। কারণ এই রাজ্যের ভাল মন্দ সব কিছুর জন্য আপনারাই অল্প বিস্তর অংশীদার, আপনারা কি কোন খারাপ খবর শুনেছেন!

ওমরাহরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে চাওয়া-চাওয়ী করে তার

পর কয়েকজন মৃদু কণ্ঠে বল্লেন, জাঁহাপনা এমন কোন খারাপ খবর তো আমরা পাইনি।

নবাব সাহেব আরেকটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, জেগে যারা ঘুমোয়, তাদের ঘুম খোদাতালাও ভাঙ্গাতে পারেন না—কি বলেন আপনারা, তাই না! কথা শুনে অনেকে উসখুশ করতে লাগলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করার ভরসা কেউ পেলেন না। নবাব সাহেব আবার বললেন, শুনলাম গাজোলের ওমরাহ সাহেব নাকি মদনাবতীর ওমরাহ সাহেবের বেটির সাথে নিজের বেটার সাদী দিয়েছেন!

—জী নবাব সাহেব।

—এই খুশ খবরটি আমাকে একটু জানানো হোল না।

—হুজুর এই সময় দিল্লীতে ছিলেন জাঁহাপনা।

—তাহলে আমার দিল্লীর যাবার পরই এই বিবাহ ব্যবস্থার উপযুক্ত সময় বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাই না!

দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ওমরাহ বললেন—গোস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা, এই শুভ কাজ করে আমি কি কোন কসুর করেছি?

কথা শুনে হেসে উঠলেন নবাব সাহেব, তারপর তীর্যক চোখে বৃদ্ধ ওমরাহর দিকে তাকিয়ে বললেন—না সাদীর ব্যাপারে কোন কসুর হয়নি ঠিক, তবে কি জানেন, দেওয়ালের তো কান আছে, তাই সুরাপান করার পর আপনারা অনেকেই যে সমস্ত আলোচনা করেছেন তার অর্থ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই বোঝায়, আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে, এর পরেও আপনাদের সব্বাইকে সরল মনে বিশ্বাস করবো?

এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন গাজী সাহেব, এবারে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—জাঁহাপনা যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, তা সঠিক নয়, আমরা দীর্ঘকাল লক্ষৌতির নবাবের বিশ্বাসভাজন হয়ে কাজ করছি, আজও করছি, অনেক নবাব শাহজাদা আমাদের রাজ্যে এসেছেন। আমরা কাউকে বিরুদ্ধাচরণ করিনি, সুতরাং নবাব সাহেবের

কাছে আমাদের আর্জি, আপনি সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করুন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ভুল খবর শুনে আমাদের ওপর অবিচার করবেন না।

—তবে কি গাজী সাহেব আমার গুপ্তচরেরা সব মিথ্যে খবরই সংগ্রহ করে আনে !

—সে কথা আমি কি করে বলবো নবাব সাহেব, তবে এ কথা বলতে পারি যে, আমিও সেই বিবাহ উৎসবে দাওয়াৎ পেয়েছিলাম। সেই উৎসব বাড়ীতে নবাব সাহেবের বিরুদ্ধে কোন আলোচনাই হয়নি। নবাব আলীমর্দ্দান মুখ ফেরালেন অন্য দিকে, বললেন, অ চ্ছা খান বাহাদুর ইসলাম সাহেব আপনি কি জানেন যে, গত সপ্তাহে যেদিন আমি দিল্লী যাই, তার পরদিন গভীর রাত্তিরে পাণ্ডুয়ায় আপনার মোকামে একটি মিলাদ মহফিলের আয়োজন হয়েছিল !

—জী নবাব সাহেব।

—সেখানেও কি আমার বিরুদ্ধে আপনারা কোন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নি !

—আপনার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক শাহানশা।

—অমূলক হলে আমি খুশিই হতাম ইসলাম সাহেব; কিন্তু এখানেও কি আমার গুপ্তচরেরা মিথ্যে খবর পরিবেশন করেছে!
—আপনি কিছু জানেন নাকি মৌলভী এব্রাহাম সাহেব ?

—জী না হুজুর, উঠে দাঁড়ালেন বুলবুলচণ্ডীর ওমরাহ :

বুলবুলচণ্ডীর মহজিদ বাড়ীতে মিলাদ হয়েছিল না !

—জী হ্যাঁ।

—আচ্ছা আপনি কি জানেন, সেই মিলাদ মহফিলে বিভিন্ন এলাকার মৌলভী, ওমরাহবৃন্দ ছাড়াও কিছু কিছু লোক এলাকার বাইরে থেকে এসে জমায়েত হয়েছিল।

—জী না, আমার জানা নেই।

—মিলাদের পর মসলেউদ্দিন ডাগর সাহেবের বাড়ীতে আপনি কি উপস্থিত ছিলেন না ?

—না।

—সেখানে কি কোন কাফের যুবককে উত্তেজিত অবস্থায় সল্লা পরামর্শ করতে শোনেন নি!

—আমার জানা নেই হুজুর।

—ঠিক আছে এসব বাদানুবাদের মধ্যে আমি যেতে চাই না, আপনারা আমার এলাকার সম্মানী মানুষ। আমি চাই আপনাদের সুবিধে-অসুবিধে, সুখ-দুঃখ সব আপনারা আমাকে বলুন, আমি আপনাদের নবাব, আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে আপনাদের সাহায্যের চেষ্টা করবো। আপনাদের সুখ-সুবিধে দেখার জন্যই তো দিল্লীর নবাব বাদশা কুতুবউদ্দিন আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। একটু থামলেন নবাব আলীমর্দ্দান, তারপর সভার চতুষ্পার্শে খুব ভাল করে তাকিয়ে বললেন—শুধু একটা কথা আপনারা ইয়াদ রাখবেন যে, আমি তুর্কীস্থান থেকে আপনাদের এই মুল্লুকে এসেছি, কারও দয়া কিংবা মেহেরবানীতে নয়, আপন হিম্মতে আমি রাজ্য শাসন করতে বসেছি। এ রাজ্যে যদি কেউ—তিনি যে কেউ হোক না কেন, আমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত বা বিদ্রোহ করার খোয়াব দেখেন, তবে আমার হাতের তরোয়াল তাকে ক্ষমা করবে না, তুর্কীরা ক্ষমা করতে জানে না।

আপনাদের অনেক ঔদ্ধত্য আমি সয়েছি কিন্তু আর না, আপনারা মুবারকের প্রতি যে অ-সৌজন্য দেখিয়েছিলেন, তা আজও আমার মনে আছে। ওকে অসম্মান করে আপনারা আমাকে এবং দিল্লীর নবাব সাহেবকেই অপমান করেছিলেন।

প্রায় এক বাক্যে সব্বাই প্রতিবাদ করতে শুরু করলে নবাব আলীমর্দ্দান আবার বল্লেন—আমি মুসলমান আপনারাও তাই, আমি নিজে খলজী বংশের হয়ে খলজীদের ধ্বংস করার দায়িত্ব নিয়েছি, কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ ছিল না, কিন্তু এখন দেখছি আপনারা নবাব-বাদশাদেরকেও আপনাদের খুব সস্তা আলোচনার বস্তু করে ফেলেছেন! তাই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম। আমার সাথে দুশমনীর চেষ্টা করবেন না, আর

কয়েক দিনের মধ্যেই আপনারা আমার ফরমান পেয়ে যাবেন, আমি রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য আপনাদের কাছে চিঠি পাঠাবো, আশা করি আপনারা সব্বাই তা যথাযথ পালন করবেন।

গাজী সাহেব কিছু বলার জন্য উস্‌খুশ করছিলেন, কিন্তু সময় পেলেন না। নবাব সাহেব কথা শেষ করেই মহলের দিকে চলে গেলেন দীপ্ত ভংগীতে। তার কাথাবার্ত্তাগুলো ওমরাহদের কানে যেন চাবুকের আঘাত সদৃশ লাগছিল, এভাবে সব্বাইকে ডেকে এনে অপমান করার কি অধিকার থাকতে পারে, এ নিয়ে সরোষে সব্বাই বলাবলি করতে করতে বেরিয়ে এলেন বাইরে, ঠিক হোল আবার নূতন করে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। তাই হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল। বৃদ্ধ গাজী সাহেবই দায়িত্ব নিলেন সবার সাথে যোগাযোগ করার। ইতিমধ্যে আলীমর্দ্দানের নির্দ্দেশটাও হাতে পৌঁছাবে। তখন ওর মতলবটাও বোঝা সহজ হবে।

বুলবুলচণ্ডীর ওমরাহ একটু ভীতু গোছের মানুষ, কেন যেন বার বার তার বুকটা ঢিপঢিপ করছিল নূতন করে মিলিত হবার কথা শুনে, ওসব ঝামেলা থেকে মুক্ত হবার বাসনায় গাজী সাহেবকে কিছু বলতেই সব্বাই গর্জ্জে উঠলো একসাথে। গাজী সাহেব বল্লেন—ওমরাহ সাহেব, নির্বিঘ্নে সুখ-শান্তি কায়েম রেখে ক্ষমতায় থেকে ওমরাহগিরী করা যায় না, এগুলোর জন্য কিছু কসরৎ করতে হয়, বুদ্ধিকে নাড়াচাড়া দিতে হয়, তা না-হোলে যে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাবে, আর ওমরাহগিরীও খতম হয়ে যাবে।

গাজী সাহেবের কথায় সব্বাই হেসে উঠলো একসাথে।

অনেকদিন আগের কথা।

ঘোড়াঘাট থেকে মিশ্র পরিবার বাসা বেঁধেছিল মহদীপুরে।

রাজধানীর কাছাকাছি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যেতে পারে, এই ভেবে নূতন করে পণ্ডিত শিরোমণি টোল খুলেছিলেন এখানে। শিক্ষা লাভেচ্ছুদের ভিড়ও বড় একটা কম হয়নি! এক পুত্র এক কন্যা আর স্বামী-স্ত্রীর পুর্ণাঙ্গ সংসারের কর্তা হয়ে পণ্ডিত শিরোমণির শেষ জীবন ভালই কেটেছে। তার দেহান্তরের কিছুদিন যেতে না যেতে গতায়ু হয়েছে বিশ্বরূপের মাতা রামমোহিনী। সবে কিশোর উত্তীর্ণ হয়েছে ভ্রাতা-ভগ্নী বিশ্বরূপ আর দেবযানীর। সংসার-অনভিজ্ঞ বালক-বালিকা আশ্রিত-পালিত হতে লাগলো দূর আত্মীয়ের কাছে। টোল বন্ধ হলেও পিতার যজমানী করে পাওয়া কয়েক খণ্ড ভূমি, বাঁচার একমাত্র রসদ, তাই আত্মীয়রাও তাদের হেলা-ফেলা করেনি।

এইভাবে কাটছিল বেশ কিছুদিন—হঠাৎ বাঙ্গলা দেশের ভাগ্যাকাশে এলো এক ভয়ঙ্কর দুষ্ট গ্রহ। খলজী শাসন শুরু হোল এদেশে। সন্দেহের দোলায় মালিক আলীমর্দ্দান তখন বেসামাল, সবে তিনি লক্ষৌতির নবাব। তাই পরিষদদের বুদ্ধি পরামর্শকে শিরোধার্য করে শুরু করলেন অত্যাচার। সবচেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ হোল খলজী বংশের মানুষদের, আর কাফের হিন্দুদের। মালিক আলীমর্দ্দানের দুষ্ট সহচর মীর মুবারক তখন এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক, তার লোভার্ত পৈশাচিক লালসার বলি হোল স্বর্গীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত শিরোমণির একমাত্র সুন্দরী কন্যা দেবযানী।

তখন শরৎকাল। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা পাল তুলে দিগ্‌বিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনি একদিন সন্ধ্যাবেলা কালীমন্দিরের কোলে এক মস্ত বড় বজরা এসে থামলো। নদীর ঘাটে তখন অগুন্তি বধূ আর কিশোরীদের ভিড়। সবার কাঁখে জলের কলসি, কাছেই বিশালাক্ষী দেবীর প্রাচীন মন্দির। আরতির ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। পূণ্যার্থীদের ভিড়ও জমতে শুরু করেছে ওখানে। নদীর ঘাটের কলরব এখন স্তিমিত আর উচ্চকিত দেবপ্রাঙ্গণ।

নাট-মন্দিরের এক কোণে নিবিষ্ট চিত্তে বিশালাক্ষীর মূর্ত্তি

দেখছিল দেবযানী। শুচিশুভ্র ব্রাহ্মণ বালিকা তখন নিজেদের মঙ্গল কামনায় দেবতার পাদপদ্মে প্রণতি জানাচ্ছে। এমন সময় মন্দিরের সন্নিকটে ভীষণ চীৎকার আর মশালের আলোয় সবাই একসাথে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মন্দিরে ঠাঁই নিতে চাইলো।

প্রাণভয়ে ভীত মহিলারা অনেকে জ্ঞান হারালেন। শতাধিক দস্যু লাঠি, বল্লম, কৃপাণসহ ঝাঁপিয়ে পড়লো দেবমন্দিরে। রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠলো শুচিশুভ্র দেবমন্দির। অপহৃতা হোল কুলবধূ আর যুবতী-কিশোরী কন্যারা। দেবযানী কয়েকবার আর্তচীৎকার করেছিল, কিন্তু নিস্ফল চীৎকার, শূন্য আকাশেই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মাত্র।

যবনের এই অত্যাচার বিশ্বরূপকে করে তুললো কঠিন ভয়ঙ্কর। কি হবে লেখা-পড়া শিখে, পাণ্ডিত্য অর্জন করে! যে শিক্ষা নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে না, যে শিক্ষায় আমরা অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে বজ্রের মত কঠোর হয়ে উঠতে পাবি না, সে শিক্ষা আমাদের ক্লীব-পংগু শিক্ষা মাত্র। সেদিন দুর্জয় শপথ নিয়েছিল যুবক বিশ্বরূপ! সারা দেশ জুড়ে যুবশক্তিকে একত্রিত করে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলো সব্বাইকে। রাজদণ্ডকে উপেক্ষা করে কখনো গোপনে কখনো রাতের অন্ধকারে গ্রাম-গ্রামান্তরে তার ভগ্নীর সেই নিদারুণ বেদনার কাহিনী বলে চলেছে সে।

নবাব আলীমর্দ্দান শুনেছেন সে কথা। কয়েকবার চেষ্টাও করেছেন বিশ্বরূপকে ধরতে। খবর পেয়ে সিপাহী যেতে যেতেই নাকি সে বিদ্যুৎ গতিতে অন্যত্র সরে পড়ে। গ্রামবাসীরা বলে, ছোকরা যাদু জানে। এই বিদ্রোহী বিশ্বরূপকে ধরার জন্য অনেক পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন শাহানশা কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। বিশ্বরূপকে ঘাঁটালে অনিবার্য্য মৃত্যু। এই রকম একটা প্রবাদ তখন সবার মুখে মুখে, কিন্তু নবাব-ভৃত্যদের ধারণা—ছোকরাকে দেশের সমস্ত মানুষ ভালবাসে—স্নেহ করে, তাই ওকে ধরিয়ে দিতে চায়না।

রাজধানী থেকে অনেক দূরে রাতের অন্ধকারে ওমরাহ গাজী

সাহেব দেখা করতে চাইলেন বিশ্বরূপের সাথে। ছোকরা যেমন তেজীয়ান তেমনি ওর বিরাট দলবল। গাজী সাহেব বিশ্বরূপের বাবার বিশেষ পরিচিত বলেই সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখে গভীর রাতে গাজী সাহেবের সাথে মিলিত হোল বিদ্রোহী যুবক বিশ্বরূপ। চার দিকের কঠোর পাহারায় গাজী সাহেব মুখোমুখী বসলেন বিশ্বরূপের। সস্নেহে পিঠে হাত রেখে কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করলেন তিনি। বিশ্বরূপ গাজী সাহেবকে কুর্ণিশ জানিয়ে গম্ভীর স্বরে বললো।

—আমাকে ভালমন্দের কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন? আপনি তো জানেন, আমি ভাল-মন্দের উর্দ্ধে। আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমি আমার শপথকে স্মরণ রেখেছি। যতদিন না সার্থক হতে পারি, ততদিন আমি ভালমন্দের কিছু জানি না, কিছু বুঝি না। নবাবের তপ্ত রক্তই আমাকে একমাত্র তৃপ্তি এনে দিতে পারে। তাই আমার এ তৃষা যতদিন না মিট্‌ছে ততদিন আমি আমাতে নেই।

গাজী সাহেব ওর কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—বিশ্বরূপ, তোমার সেই সুযোগ এসেছে, আর সেই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।

—কিন্তু আমি আপনার সাথে খোলাখুলিভাবে বিশ্বাস করে সব কথা বলবো কোন্ ভরসায়?

—তোমাদের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। তুমি যখন শিশু, তখন থেকে তোমার পিতার সাথে আমার হৃদ্যতা ছিল, এ কথা তুমি নিশ্চয়ই জেনেছ। তুমি আমার পুত্রের সমান, তাই তোমার সাহস, বীরত্ব, বুদ্ধি, চাতুর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছে বলেই আজ তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করতে চাই!

—বেশ, বলুন কি করতে হবে আমাকে?

—তুমি বোধ হয় জাননা, তামাম লক্ষ্ণৌতি রাজ্যের ওমরাহ, আমীর ও সম্মানিত ব্যক্তিরা আজ নবাবের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত। তারা নবাবের দরবারে অপমানিত হয়েছে, আর সেই অপমানের বদলা নিতে চায়।

—খুব ভাল কথা। এতদিনে তাহলে তাদের হুঁশ হোল!

—হুঁশ হয়েছিল অনেক আগেই, কিন্তু সুযোগ মিলছিল না, এখন মিলেছে। তুমি কি তোমার দলবলসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উৎপাত সৃষ্টি করে নবাবকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে পারো?

—কি লাভ তাতে?

—কেন, নবাব দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যখন বিভ্রান্ত হয়ে উঠবেন, সেই সুযোগে আমরা তাকে আক্রমণ করবো!

—তার মানে আমাকে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এগোতে হবে। আর আপনারা নিষ্কণ্টক হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, এই তো!

—না, না, তুমি আমাদের ঠিক বুঝতে পারছ না বিশ্বরূপ, শুধু শুনে রাখ, যদি সুদিন আসে, তবে এ রাজ্যের প্রথম সম্মানের অধিকারী হবে তুমি।

—বেশ তাই হবে। তবে এ সব ব্যাপারে নিজেদের তৈরী করে নিতে বেশ কিছু অর্থ প্রয়োজন, আমার তো তা নেই।

—সে জন্যে চিন্তা করোনা। তুমি আরো বেশী সংখ্যক বিশ্বাসী যুবা সংগ্রহ কর, যারা তোমার নেতৃত্বে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। টাকা পয়সার ভাবনা করার দরকার নেই। এ ব্যাপারে নবাব হুসামুদ্দিনই সব ব্যবস্থা করবেন!

—কে? নবাব হুসামুদ্দিন!

—হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত গোপনে আমাদের সল্লা-পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া আমরাও তোমাকে যথাসাধ্য মদৎ যোগাব।

—কিন্তু আমি তো কাফের, আমাকে কি সব আমীর ওমরাহরা বিশ্বাস করবে!

—আমি যখন করছি, তখন নিশ্চয়ই সব্বাই করবে।

—ঠিক আছে, আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে আপনাকে আমার কার্য-পদ্ধতি সব বিস্তারিতভাবে জানাবো।—সেলাম।

বিশ্বরূপ তার দলবল নিয়ে যেমন অতর্কিতে এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে গেল তড়িৎ বেগে। যেন এক ঝাঁক তীর ছুটে গেল অন্ধকারের বুক চিরে। গাজী সাহেব অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পেলেন। বিশ্বরূপকে দেখে মনে হোল, ও যেন জীবন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বিপ্লব জ্বলন্ত অগ্নিমশাল। একে ঠিক মত কাজে লাগাতে পারলে সুফল সুনিশ্চিত। গাজী সাহেব পার্শ্বচরদের সাথে নিবিড় অন্ধকারে মিশে গেলেন, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলেন না। চারদিকে আলী মর্দ্দান আর ইকবালের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোকরাগুলো ঠিক মত ওদের আস্তানায় ফিরতে পারবে তো! হৃদয়ের করুণ জায়গাটা যেন ওদের জন্য হঠাৎ আর্দ্র হয়ে উঠলো গাজী সাহেবের। পার্শ্বচরদের উদ্দেশ্যে বললেন—পণ্ডিতের ছেলেটা পাক্কা ইমানদার। যেমন মরদের মত শরীর, তেমনি হিম্মত রাখে। এইরকম আধমণ কলিজা না হলে কি আলীমর্দ্দানের বিরুদ্ধে লড়া যায়! বিশ্বরূপের প্রশংসায় আপন মনে ভাবতে ভাবতে নিজেই খুশী হয়ে উঠলেন গাজী সাহেব।

হপ্তা ঘুরতে না ঘুরতে নয়া কানুনের নির্দ্দেশ এসে গেল। তামাম মুল্লুকের আমির ওমরাহ্ শাসনকর্ত্তাদের কাছে নবাবের ফরমান জারী হোল। যখন তখন যেখানে সেখানে মহফিল কিংবা উৎসব আনন্দানুষ্ঠান করা যাবে না। সরাবী পান বিলকুল কমাতে হবে। সাদী, আখিকার ব্যাপারে নবাব সাহেবের দরবারের হুকুম নিতে হবে। প্রতিমাসে দুইবার নবাব শাহানশার প্রতিনিধির সাথে মুলাকাৎ করে খবরাখবর দিতে হবে। এই হোল ফরমান।

নবাবী ফরমান পেয়ে সবাই হতভম্ব। বলে কি! নবাবের মাথা ঠিক আছে তো! নিজের বেটা বেটির সাদী দিব, বাচ্চার

আখিকা করবো তার জন্যও হুকুম! প্রাণ খুলে সরাবী খাবো, তাও মানা, এমন কি মহফিল—আনন্দ উৎসব তাতেও বাগ্‌ড়া। তাজ্জব মানুষ দেখছি! অনেক মৌলভী মোল্লা, আমীর এই হুকুমকে গুজব বলে বর্ণনা করলেন। কিন্তু না, মেনে থাকবার হিম্মৎ হোল না কারো, কারণ যে-কোন স্থানে গুপ্তচরের নির্দ্দেশে কালাপোষ বাহিনী ছুটে এসে তামাম রাজ্য দিবে জ্বালিয়ে, আর জান করবে কোতল।

আবার সবাই ছুটলো গাজী সাহেবের কাছে।

প্রবীণ মানুষ। দারুণ বুদ্ধি খেলে মাথায়। যে কোন কঠিন সমস্যা সমাধান করতে তার আর জুড়ি নেই। গাজী সাহেব সবাইকে দেখেই মালুম করলেন ব্যাপারটা, হেসে বল্লেন—কি হোল আপনাদের! নবাবের ফরমান পেয়ে মাথা গরম বুঝি!

—হ্যাঁ তাই, এরকম অন্যায় জুলুম আমরা আর কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।

—কি করবেন তবে?

—আমরা মিলাদ মহফিল করবো। স্বাধীনভাবে সাদীর ব্যবস্থা করবো। যা ইচ্ছে তাই করবো।

—ওর ফল কি ভাল হবে! তার চেয়ে আর কিছু দিন অপেক্ষায় থাকুন। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন, অধৈর্য্য হলে চলবে না। জানেন মিরচা পেকে লাল না হোলে তা ঝাল হয় না, তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

সবাইকে সাথে নিয়ে গাজী সাহেব গোপন কামরায় ঢুকলেন। বাইরে দ্বাররক্ষী পাহারায় মোতায়েন রইলো।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, —দেখুন আমি বৃদ্ধ হয়েছি, সব সময় হয়তো আপনাদের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারি না, বুদ্ধিরও জোগান দিতে পারি না। এবার আপনাদের মধ্য থেকে কেউ দায়িত্ব নিন।

সব্বাই একবাক্যে আপত্তি জানিয়ে বলে উঠলো।

—তা হয় না গাজী সাহেব, আপনিই আমাদের নেতা।

—বেশ, আপনারা যখন সব্বাই বলছেন, তখন দেখি শেষ চেষ্টা করে। এখন তো বৃদ্ধ হয়েছি, খুন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তবু যদি আপনারা মদৎ দেন—ভরসা দেন, তবে এই জুলুমবাজী, এই অত্যাচার শেষ করার চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করবো। তবে তার আগে পবিত্র কোরাণ শরীফের নামে আপনাদের কসম কাটতে হবে যে, আপনারা কোন লোভে কিংবা স্বার্থে কিছুতেই বেইমানী করবেন না। আমিও আপনাদের সম্মুখে কসম করে বলছি, আপনাদের দেওয়া সব দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করবো।

সব্বাইকে নিস্তব্ধ দেখে গাজী সাহেব আবার বল্লেন—কসমের কথা বলছি বলে আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। রাজনীতির পথ বড়ই বন্ধুর আর কণ্টকাকীর্ণ। তাই আমরা সব্বাই যেন সব্বাইর কাছে বিশ্বাসভাজন থাকতে পারি, সেজন্যই এই আবেদন।

আপনারা তো শুনেছেন নবাব আলীমর্দ্দানের কথা। কোথায় কখন কিভাবে আমরা মিলিত হয়েছি তা পর্যন্ত তার কানে পেঁ ৗছেছে। অবশ্য নবাব সাহেব কিছু কিছু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে আমাদের পরখ করতে চেয়েছেন। মোটের ওপর একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের প্রত্যেক সাক্ষাৎকারের খবর তিনি পেয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য—কি বলেন আপনারা?

গাজী সাহেব শ্যেন দৃষ্টিতে প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বল্লেন—আচ্ছা বলুন তো, আপনারা কি কোন দিন ভেবেছেন যে, আপনাদের পরিবারের কেউ কিংবা নিজেরা স্বাধীনভাবে, ভয়-শূন্যভাবে চলতে পারবেন না—জেনানাদের ইজ্জত রক্ষা হবে না। চোখের সামনে খুন-খারাপী হলেও কিছু বলা চলবে না, এমন কি নিজের ইচ্ছায় কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান পর্যন্ত করতে পারবেন না। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার চোখের সম্মুখে অনেক নবাব বাদশা দেখলাম,

কিন্তু আলীমর্দ্দানের মত নীচ চরিত্রের লোক আমি জীবনে দেখিনি, সে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর—বাঘের চেয়েও হিংস্র এর স্বভাব।

কথা বলতে বলতে আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল গাজী সাহেবের। সমস্ত ওমরাহবৃন্দ কোরাণের নামে শপথ করে নবাবের অত্যাচারের শেষ করার জন্য গাজী সাহেবকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিতেই তিনি বল্লেন—তামাম এলাকায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে, আরো উঠবে। এখন দরকার হচ্ছে টাকার, আপনারা সব্বাই মিলে যদি এন্তেজাম করতে পারেন, তবেই আপনারা আপনাদের সুখ-সমৃদ্ধি ফিরে পাবেন, তা-না-হলে যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকতে হবে। সবার সাথে কথা শেষ করে গাজী সাহেব রওনা হলেন নবাব হুসামুদ্দিনের মহলে, যেখানে নবাব চরম বিপদাপন্ন হয়ে মৃত্যু আশঙ্কায় ভীত হয়ে জীবন যাপন করছেন।

রাত গভীর। আশমানের চাঁদে তামাম পথটা উজালা দেখাচ্ছে। গাজী সাহেবের ঘোড়া আলো-আঁধারি পথ দিয়ে ছুটে চলেছে সম্মুখে। অনেকটা এসেছেন তিনি। ক্লান্ত শরীরে আর পথ চলতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু না চলেও উপায় নেই। সামনের রাস্তাটা ভয়াবহ, চার দিকের গাছপালা জায়গাকে অন্ধকার করে রেখেছে, তার মধ্য দিয়ে সরু পথ। অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন তিনি, হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে চমকে অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর চতুষ্পার্শ্বে প্রায় জনা ত্রিশেক অশ্বারোহী বর্শা হাতে উপস্থিত। তিনি চোখে কিছু ঠাহর করতে পারলেন না, ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তোমরা কারা? কি জন্য এই গভীর জঙ্গলে আমার পথ রোধ করেছ। কি চাও তোমরা?

—আমরা তোমার সর্ব্বস্য চাই।

—আমার তো কিছু নেই।

— তোমার জান তো আছে।

—তাই নেবে। ঢোক গিললো গাজী সাহেব, তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আমার মত বৃদ্ধকে মেরে তোমাদের কি লাভ হবে বাবা?

—তা জানিনা, আমাদের সর্দ্দার আসুক, তিনিই ঠিক করবেন তোমাকে নিয়ে কি হবে।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তাঁর। এই গভীর রাতে এভাবে বেরোনো খুবই বোকামি হয়েছে, জীবনের শেষে এভাবে বেঘোরে প্রাণটা যাবে, একথা ভাবতেই সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো তার। সহসা একটা গুঞ্জন শোনা গেল, মনে হোল সর্দ্দার এলো ওদের।

বৃদ্ধ গাজী সাহেব আবার বল্লেন—সর্দ্দারজী কি এলেন? শব্দ নেই। শুধু একটি দীর্ঘদেহী পুরুষ বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে তার মুখোমুখী এসে শুধালেন—কে, গাজী সাহেব না? চমকে উঠলেন গাজী সাহেব, পরিচিত কণ্ঠস্বর তার।—কে আপনি?

—আমি বিশ্বরূপ।

—বিশ্বরূপ!

আবেগে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ। তারপর বল্লেন—তুমি না এলেতো এরা আমার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিত আজকে। তুমি বড় ঠিক সময় এসেছো বিশ্বরূপ, খোদাতালার অসীম করুণা।

—না গাজী সাহেব, আমি না এলে কেউ আপনার কেশস্পর্শ পর্যন্ত করতো না। এটাই আমার দলের নির্দ্দেশ। থাক সে কথা, কোথায় যাচ্ছিলেন বলুন—পৌছে দিয়ে আসি।

সারা পথে বিশ্বরূপ আর গাজী সাহেব। তাদের সাথীরা ফিরে গেছে নিজেদের আস্তানায়। বিশ্বরূপদের অসীম সাহস আর বীর্য-বত্তার প্রশংসা করতে করতে এক সময় তারা নবাব হুসামুদ্দিনের মহলে এসে পৌছলেন।

অনেক রাত। তিনজনে সলাপরামর্শ হোল। নবাব হুসামুদ্দিন কয়েক সহস্র মুদ্রা তুলে দিলেন বিশ্বরূপের হাতে। বললেন—বিশ্বরূপ যদি দিন ফেরে—সুদিন আসে, সেদিন এই হতভাগ্য হুসামুদ্দিন তোমার উপযুক্ত সম্মান দিতে ভুলবে না, এই কথা মনে রেখে কাজ করে যাও। প্রয়োজনে গাজী সাহেবের সাথে মোলাকাৎ করলেই সমস্যার সমাধান হবে।

উঠে দাঁড়াল বিশ্বরূপ। গম্ভীর স্বরে নবাবের উদ্দেশ্যে বললো—আমরা বেইমানী করি না, কথানুযায়ী কাজ না করতে পাবলে দুশমনের দয়া ভিক্ষা করে জীবন ফিরিয়ে নিয়ে আসি না। আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন নবাব সাহেব, বিশেষ করে আমার পিতৃবন্ধু গাজী সাহেব যখন আমাকে আপদে বিপদে সাহায্য করছেন, তখন আমার বিশ্বাস—আলীমর্দ্দানের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। নবাব হুসামুদ্দিন বিশ্বরূপের হাত জড়িয়ে ধরে বল্লেন—দোয়া করছি, বিশ্বরূপ তুমি জয়ী হও, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

বেশ কিছুদিন থেকেই মেজাজটা শরীফ যাচ্ছিল না মুজাফ্ফর ইকবালের। পেয়াসবাড়ী আর নবাবগঞ্জ দু'জায়গায় ছুটোছুটির টানা পোড়েনে আর ভাল লাগছিল না কিছু। নবাবী ফরমানে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে একটু মৌজ করারও উপায় নেই। চারদিকে দুশমনের সজাগ চোখ, কখন কোন বদমাশ হুজ্জত করে বসবে, কে জানে! তার চেয়ে সেই রাতের বেলা নিজের মহলে বসে যা একটু হয়। তার ওপর আবার জোর খবর—ভাতিন্দায় নাকি আবার ঝামেলা দেখা দিয়েছে। বেইমান প্রজারা খাজনা দিতে চাইছে না। নবাবী হুকুম তামিল করছে না! দেশে ফসল নেই, সেই অজুহাতে

খাজনা দেয়া হবে না বলে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে যদি কোন বিশ্বাসী কাউকে পাওয়া যেতো, তবে ভাতিন্দার প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা যেতো।

মুজাফ্ফর ইকবাল নিজ মহলে মৌজ করে সেরাজীতে চুমুক দিচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন নিজ রাজ্যের কথা। তামাম মুলুকটার একটা ছবি এঁকে কাকে কোথায় বসানো যায় সেকথাই ভাবছিলেন তিনি। সহসা গওহরের কথা মনে হোল। তাকে নবাবগঞ্জের দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলে রেখেছেন তিনি, কিন্তু এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। দেই-দিচ্ছি করেও গওহরের ধৈর্য্য পরীক্ষা করছিলেন তিনি। অবশ্য সে ছাড়া বিশ্বাসী লোকই বা কোথায়! তবে গওহরকে নজর রাখতে পাক্কা লোক দরকার, যেন নিজেই মালিক হবার খোয়াব না দেখে। অবশ্য গওহর দু'পয়সাকা আদ্মী। ঠিক প্রয়োজনের সময় ঠিক মানুষের কথা মনে পড়ায় খুশী হয়ে নিজের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলেন না তিনি। নিজের অসাধারণ বুদ্ধি চাতুর্য্যের কথা বার বার মুবারককে বলেছিলেন তিনি, কিন্তু মূর্খ মুবারক তাকে আমল দিতে চায়নি। মুহূর্তে দূত ছুটলো আলী গওহরের কাছে, জরুরী এত্তেলা—নবাব মুজাফ্ফর ইকবাল হোসেনের সাথে জরুরী মুলাকাৎ-এর হুকুম।

অনেক দিন আগের একটা পুরানো কথা মনে গুন্গুন্ করে উঠলো ইকবালের। এই সেই আলী গওহর। মুবারকের বেগম আসমানতারাকে আনতে পারে নি সত্য, কিন্তু খলিদা বান্নুকে সযত্নে তুলে দিয়েছিল তার হাতে। যেন একটা তাজা ফুটন্ত বসরাই গুলাব। মুবারকের নুন খেয়েও তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে একটুও কসুর করেনি সে, সুতরাং ইকবালের সাথেও যে বেইমানি করবে না, তার বিশ্বাস কি? তাই পথঘাট বেঁধেই পা ফেলতে হবে অত্যন্ত সন্তর্পণে।

ইকবাল বাজিয়ে দেখতে চায় আলী গওহরকে। খুব ধীরে ধীরে লোভের সুতো ফেলে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে চায় তাকে,

কারণ ইকবাল বুঝেছে আলী গওহর কাজের লোক, বিশেষ করে নারী রত্ন চিনতে এবং সংগ্রহ করতে ওর জুড়ি নেই। তাই আলী গওহরকে ওর বিশেষ প্রয়োজন। অন্তত আলীমর্দ্দান যতক্ষণ লক্ষৌতির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ততক্ষণ বটেই।

আখতার নার্গিস নিজের ঘরে বসে বসে ভাবছিল দেলোয়ারের কথা। কখন বেরিয়েছে মানুষটা আর কখন যে ফিরবে তার কিছু ঠিক নেই। অথচ যাবার সময় বার বার মিনতি করে বলেছে— তাড়াতাড়ি ফিরতে। বেগম আখতার আজ সুন্দর করে সাজিয়েছে ওর ছোট্ট ঘরটিকে। ফুলে ফুলে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে ওর শয্যা। অনেক বছর বাউণ্ডুলে জীবন কাটিয়ে এবার সংসারী হবার প্রাক্কালে জীবনের স্মরণীয় মধুরতম দিনগুলিকে কেন্দ্র করে আপনজনকে খুব কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে উঠেছে বেগম আখতারের মন।

আজ ওর নিজের জন্মদিন। অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে বসে নিজেকে সাজিয়েছে স্বল্প অলংকার আর ফুলের সম্ভারে। এই বিশেষ দিনগুলি অতীতে কত বিচিত্র সমারোহে কেটেছে। কত উচ্ছলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ভরা মুহূর্ত্তগুলি মনে হোলে আজ বিরক্ত আসে। এ শুধু অপচয়—শুধু গ্লানি। কিন্তু আজকের জীবন যেন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের স্বাদে পরিপূর্ণ—পবিত্রতার শিখায় উদ্‌ভাসিত। আগের জীবন শুধু ছিল ভোগের—লালসার। পতঙ্গরা ছুটে আসতো কামার্ত্ত হয়ে, অর্থের অহমিকায় নিজেদের জড়িয়ে। কিন্তু এখন সে পরিপূর্ণ। দেলোয়ারের প্রেম তাকে দিয়েছে শান্তি, দিয়েছে তৃপ্তি, পেতে চলেছে পরম পাওয়া ধন মাতৃত্বের আস্বাদ।

বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দে সচকিত হোল বেগম আখতার। নিশ্চয়ই দেলোয়ার এসেছে। হাসিমুখে ওকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে একটু চিন্তান্বিত হোল সে, দেলোয়ারের মুখে কেমন দুশ্চিন্তার

করাল ছায়া, চেহারায় কেমন রুক্ষতা। পোষাক খুলতে সাহায্য করতে করতে উৎকণ্ঠিত স্বরে বললো—

—তোমাকে এমন চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে কেন, কি হয়েছে তোমার?

—না, তেমন কিছু নয়।

—তোমাকে তো এর আগে কোনদিন এত বিমর্ষ দেখিনি!

বেগম আখতারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেলোয়ার বললো—জানো বেগম—আমার পদোন্নতি হয়েছে।

—এ তো খুব খুশীর কথা।

—না খুশীর নয়, এ আমার জীবনের দুঃসহ অভিশাপের বোঝা। আমার কলঙ্কস্বরূপ।

—কি বলছো তুমি?

—ঠিকই বলছি বেগম, নবাব ইকবাল আমায় নবাবগঞ্জের দেখা শোনার ভার দিয়েছেন। সেখানে আলী গওহর বলে একজন সর্দার শাসনকর্তা হয়ে কাজ করবেন আর আমি তামাম মুল্লুকের যাবতীয় খবরদারী করে বেড়াবো।

—ভালই তো, এতে মন খারাপের কি আছে?

—তুমি জানো না আখতার, শুনেছি সেই আলী গওহর নাকি চরিত্রহীন লম্পট। ওর মত ভ্রষ্টাচারির সাথে কাজ করবো কি করে! তাছাড়া ও নাকি নবাব ইকবালের পেয়ারের লোক। সুতরাং ওর খেয়াল খুশী চরিতার্থ করতে হয়তো আমাকে অনেক দুষ্কর্মের ভাগ নিতে হবে। কিন্তু তুমি তো জানো বানু এ সব আমার ভাল লাগে না।

—আচ্ছা কোন্ আলী গওহর বলতো? যে নাকি মুবারকের সাথে কি একটা ঝামেলা করেছিল সেই কি?

—হ্যাঁ সেই আলী গওহর, কিন্তু তুমি কি করে জানলে বানু? দেলোয়ারের প্রশ্নে হকচকিয়ে যায় আখতার বেগম। পরিচয় গোপন করে থাকার বিড়ম্বনা অনেক। সেকথা মনেই ছিল না তার। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য বললো—কার কাছে যে শুনেছিলাম ওর কথা,

ঠিক মনে নেই, তবে এটা মনে আছে যে এই আলী গওহরই নাকি মেয়ে চুরিতে খুব সিদ্ধহস্ত। ত্তাখো বাপু আমি যেন আবার চুরি না হয়ে যাই। আখতার বান্নুর লঘু রসিকতায় হেসে উঠলো দেলোয়ার হোসেন। তারপর ওরা দু'জনে নিজের ঘরে ঢুকতেই খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো দেলোয়ার। আদরে আখতারকে জড়িয়ে ধরে বললো, কি করেছ বান্নু ঘরখানাকে, একেবারে বেহেস্ত বানিয়ে ফেলেছ দেখছি, কি ব্যাপার বলতো?

—তোমার কি মনে হয়?

—কিছু বুঝতে পারছি না তো।

মিষ্টি হাসি হেসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আখতার বেগম। তারপর বলে—আজ আমার জন্মদিন।

—তাই বুঝি!

আবেগে নিবিড় করে খুব কাছে টেনে নিয়ে সোহাগ করে আখতার বান্নুকে।

আগুন জ্বলে উঠেছে।

বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে তামাম লক্ষৌতির সাম্রাজ্যে, সীমান্তে সীমান্তে। কালাপোষ সৈন্যদের মত বিশ্বরূপের বাহিনী নবাবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে চলেছে প্রজাবৃন্দকে। ভাতিন্দা, ঘোড়াঘাট, গাজোল, মদনাবতীতে। প্রজারা এক পয়সা খাজনা তো দেয়ইনি, উল্টে তহশীলদারকে পিটিয়ে তাড়িয়েছে মুল্লুক থেকে! ওদিকে লক্ষৌতির কাছাকাছি পাণ্ডুয়ার গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত কৃষকরা ক্ষোভে গর্জ্জে উঠেছে, সর্ব্বত্র কেমন যেন বিদ্রোহের ভাব।

নবাব আলীমর্দ্দান সমস্ত খবরটা শুনে উজীরের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—বুঝেছ নওয়াজ, ইকবালটা একদম অপদার্থ উজবুক। না পারে রাজ্য শাসন করতে, না পারে উপযুক্ত সময়ে সমস্ত খবরাখবর দিতে। সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে আমার বিরাট

সৈন্য বাহিনী মুষ্টিমেয় কাফের ছোকরাদের ধরতে পারছে না, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা উজীর।

উজীর সাহেব বিরস বদনে নবাবের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, —জাঁহাপনা, কাফের দিয়েই কাফেরদের ধরতে হবে, এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

—কি রকম ?

—কাফেরদের মধ্যে যারা সর্দ্দার গোছের, কিংবা যারা খুব বেপরোয়া সেই সমস্ত লোককে টাকা ছিটিয়ে বশ করতে হবে। দুশমন হত্যা করতে হবে দুশমন দিয়েই।

কথাটা মনঃপুত হোল না নবাব সাহেবের। বিরক্তির স্বরে বলে উঠলেন—নাঃ ওসবে কিছু হবে না। ওদের ধরবার জন্য তো ইনামের কথা ঘোষণা করেছিলাম, কিন্তু কই কেউ তো এল না। আসলে আমার সিপাহীরাই অপদার্থ। শুধু সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টাতেই তারা মগ্ন। দেশের শুভাশুভ খোঁজ খবরে তাদের কোন চিন্তাই নেই।

গম্ভীর মুখে পায়চারী করতে করতে সহসা নবাব সাহেব বলে উঠলেন—এসব ব্যাপারে মুবারক ছিল সাচ্চা হিম্মৎদার, শেরের মত ঝাঁপিয়ে পড়তো দুশমনদের সামনে। আর এই ইকবালটা হচ্ছে বিলকুল ডরপোক, দুশমনের নামে ওর কলিজা ছোট হয়ে যায়। নাঃ ওকে আর রাখা গেল না দেখছি।

নওয়াজ কথা বলার সাহস পেলো না, শুধু নবাব শাহানশার দিকে তাকিয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল করে।

নবাব আলীমর্দ্দান ইকবালকে এত্তেলা পাঠাবার হুকুম দিয়ে মহলার দিকে পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়ালেন একবার, তারপর হঠাৎ উজীরের দিকে তাকিয়ে বললেন—নওয়াজ এই সংগে গাজী সাহেব কেও আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা লিখে দিও—জরুরী দরকার।

নিজের খাস মহলে বসে বসে নবাব শাহানশা মালিক মীরমর্দ্দান ভাবছিলেন রাজ্যের প্রকৃত অবস্থার কথা। মাত্র বছর দেড়েক হয়েছে এ রাজ্যের গদীতে বসেছেন কিন্তু একটি দিনের জন্য শান্তি মেলেনি তাঁর। সমস্ত দেশ জুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে শুধু চক্রান্ত আর চক্রান্ত। একদিক সামাল দিতে গেলে আরেক দিক থেকে দুশমনরা মাথা চাড়া দেয়। শুধু বিদ্রোহ আর বেইমানী। ক্লান্ত নবাব অনেক দিন পর একটু সেরাজী আমেজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাইলেন। আর সাথে একটু গান—খানিকটা ফুর্ত্তি।

খিদমদকারেরা হুকুম মাফিক ব্যবস্থা করতেই সেরাবী নিয়ে বসে পড়লেন নবাব। ইয়ার নেই—দোস্ত নেই, বিলকুল একা, শুধু সামনে বসে একটি উদ্ভিন্নযৌবনা বসরাই গুলাবের পাপড়ীর মত টাটকা প্রাণস্পন্দনে পূর্ণ বাঈজী, কণ্ঠে যেন ঝরে পড়ছে সুধা ধারা।

নবাব অবাক চোখ মেলে তাকালেন বাঈজীর দিকে, তার দু' চোখে কেমন যেন কামনার ঘন ছায়া, নবাব স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধালেন—তুমি কে ?

—আমি জারিয়া জাঁহাপনা।

—জারিয়া ?

—জী হ্যাঁ।

—কই এর আগে তো তোমাকে কোন দিন দেখিনি ?

—ছোট ছিলাম বলে আপনার সম্মুখে কোন দিন আসতে দেয়া হয়নি জাঁহাপনা।

—এখন বুঝি বড় হয়েছ ?

—মাথা নীচু করে সম্মতি জানায় জেনানা।

—বেশ, আমার কাছে এসোতো।

—কাছে! কেঁপে উঠলো নারী কণ্ঠ দ্বিধায়। ইতস্তত করতেই নবাব বল্লেন—কই, তুমি যে বল্লে বড় হয়েছ: এসো ভয় কি, কাছে এসো।

এক পা এক পা করে ধীরে ধীরে নবাবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোরী বাঈজী। নবাব পরম আগ্রহে বাঈজীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধালেন—কি নাম তোমার ?

—আয়েষা, আয়েষা আঞ্জুমান আরা।

—বাঃ ভারি সুন্দর মিঠা নামতো তোমার।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে বাঈজী। নবাব গুলাবী সেরাজীতে ঠোঁট ভিজিয়ে বল্লেন—একটা গান শোনাও তো, খুব মিঠা করে গাও।

বাঈজী সুরেলা কণ্ঠে গান ধরতেই নবাব খুশীতে মশগুল হয়ে উঠলেন। তারপর এক সময় টলতে টলতে দরজাটা বন্ধ করে বাঈজীর দিকে এগিয়ে গেলেন পায়ে পায়ে !

অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠলো বাঈজী। অসহায় কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ তুলে কিসের যেন প্রার্থনা জানালো সে, কিন্তু ততক্ষণে একটা ভয়াল অজগর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে হরিণ শিশুকে। চার দেয়ালের মধ্যে মৃগ শিশু আর্তনাদ করে উঠলো, কিন্তু তা বিশাল নবাবপুরীর আর কেউ জানতে পেলো না।

আলী গওহর আপাতত নবাবগঞ্জের দেখা-শোনার দায়িত্ব পেয়েছে। শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবার জন্য, সৎপরামর্শদাতা হিসাবে দেলোয়ার হোসেনকে যেতে হয়েছে তার সাথে নবাবগঞ্জের মহলে। সুচতুর ইকবাল দেলোয়ারের পিঠ চাপড়ে সাহস জাগিয়ে বলেছে, তার একমাত্র কাজ হচ্ছে আলী গওহরের সমস্ত গতিবিধি কার্যকলাপ লক্ষ্য করা, আর নিয়মিত পেয়াসবাড়ীতে যোগাযোগ করা।

ইতস্তত করছিল দেলোয়ার, এসব ঝক্কি ঝামেলা ভাল লাগে না তার। তাছাড়া, এ মুল্লুকে তো তার চেয়ে অনেক বিচক্ষণ সর্দার

রয়েছে, তবুও ইকবাল সাহেবের নজর যে তার প্রতি কেন পড়লো তা বিসমিল্লাই জানেন। সঙ্কোচ-শঙ্কা ত্যাগ করে বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলা সত্ত্বেও নবাব ইকবাল হোসেন তার কোন কথার আমল দেননি।

আলী গওহর এ তল্লাটে এসেই আমীর চৌধুরীদের ডেকে আলাপ আলোচনা করে এলাকার শান্তি প্রচেষ্টায় সচেষ্ট হোল; ভাবখানা এই যেন সেই এলাকার সম্রাট। বাকচতুর গওহর গরীব ঘরের ছেলে হলেও সারা জীবন চাটুকারীতায় হাত পাকিয়ে, আমীর ওমরাহদের কাছে কাছে থেকে খান্দানিদের আদপ-কায়দা রপ্ত করেছে বেশ কায়দা করে।

প্রথম প্রথম দেলোয়ার হোসেন তামাম এলাকার প্রকৃত অবস্থা জেনে সঠিক পথে চলবার জন্য কিছু কিছু আলোচনা করতে চাইতো আলীর সাথে। কিন্তু আলীর ভাবভংগিতে দেলোয়ার দুঃখ পেতো। আলীর আচরণ ওর কাছে বিসদৃশ লাগতো। সব সময় যেন প্রভুত্ব আর অহংকারের জারক রসে ডুবে থাকতে ভালবাসে আলী গওহর। দেলোয়ার হোসেন বুঝলো আলী গওহরকে আর কিছুতেই লালসার পথ থেকে ফেরানো সম্ভব নয়। এবার হয়তো প্রত্যক্ষ বিরোধীতা করতে হবে কিংবা নবাব ইকবালের কাছে সমস্ত জানিয়ে দেয়া।

দেলোয়ার হোসেনের এসব ভাল লাগেনা। ক্ষমতা, লোভ, লালসা মানুষের মনুষ্যত্বকে অপহরণ করে। বিবেককে হত্যা করে। শুভ বুদ্ধিকে লোপ পাইয়ে দেয়। তার চেয়ে এই সাধারণ জীবন অনেক আনন্দের, অনেক সুখের। লালসার স্রোত যেখানে স্তব্ধ—তৃপ্তির পূর্ণতা সেখানে অনেক বেশী। বেগম আখতার একদিন বলেছিল—তোমাকে এ সিপাহী সর্দ্দারের বেশে না পেয়ে যদি কোন গায়ক-প্রেমিক হিসেবে পেতাম, তাহোলে আমি মনে করতাম, আমার ঐশ্বর্য্য যে-কোন নবাব বাদশার চাইতে অনেক বেশী। আখতারের কথাটা মনের মধ্যে বার বার পাক খাচ্ছিল দেলোয়ারের মনে।

দেখতে দেখতে বেশ কিছু দিন কেটে গেল দেলোয়ার হোসেনের। আলী গওহর যেন জাঁকিয়ে বসছে ধীরে ধীরে। নবাব আলীমর্দ্দানের ফরমান পর্যন্ত এ তল্লাটে বাতিল হতে চলেছে। প্রতি সপ্তাহেই নাচ-গানের মজলিস আর গুলাবী সেরাজীর ব্যবস্থা। দল ভারি করবার চেষ্টায় প্রথম দেলোয়ারও আমন্ত্রণ পেতো, কিন্তু যেতো না, আর আজকাল তো শোনা যায় আলী গওহর নাকি সেরাজীতে চুমুক দিতে দিতে বলেছেন—দেলোয়ারটা বিলকুল বেওকুফ্, ও মুসলমানের ঘরে জন্মেছে বটে কিন্তু ওর আচরণ কাফেরদের মত। কথাটা কানে এসেছে দেলোয়ারের, কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি একটুও। কিইবা দেয়ার আছে, আলী গওহরের মত সামান্য চাটুকারের কথায় উত্তেজিত কিংবা আনন্দিত হওয়াটা মুর্খামি মাত্র।

নবাব ইকবাল হোসেন অত্যন্ত গোপনে এত্তেলা পাঠিয়েছেন দেলোয়ারের কাছে, দেখা করার জরুরী তলব। নিজের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে কয়েকদিন দেশ থেকে ঘুরে আসার প্রস্তাব করতেই বেঁকে বসলেন দিবাস্বপ্ন বিলাসী আলী গওহর। অনেক জরুরী কাজ নাকি তার অপেক্ষায়, সুতরাং ছুটি বিলকুল বন্দ্। দেলোয়ার কথা বাড়ালো না, শুধু বাড়ী যাওয়ার কথাটা জানিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এলো সম্মুখ থেকে।

সারাপথ আখতার বেগমের সুন্দর মিষ্টি মুখটা মনে ভাসতে লাগলো দেলোয়ার হোসেনের। ওর সাথে আলাপ হবার পর এই প্রথম এতদিন অদর্শনে অস্থির চিত্ত দেলোয়ার অনুভব করলো—আখতার ওর জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিঃশ্বাসের মত জড়িয়ে আছে। বার বার ওর কথা ভাবতে খুব ভাল লাগলো দেলোয়ার হোসেনের। আখতার বানু ওর মনের বিরাট ফাটল পূর্ণ করেছে, তার ভালবাসা দিয়ে। এ ক'দিনেই পরমায়ু যেন বাড়িয়ে দিয়েছে ঢের বেশী। দেলোয়ার কল্পনা করতে লাগলো—আখতার বানু মা হয়েছে, খুশীতে

ঝলমল করছে মুখ চোখ। সারা দেহে কেমন শান্তির স্বর্গীয় আভা।

দেলোয়ার আরো দ্রুত ছোটার জন্ম অশ্বকে আঘাত করলো। পেয়াসবাড়ীর মহলায় বসে সমস্ত খোঁজ খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন নবাব ইকবাল হোসেন, তারপর বল্লেন—দেলোয়ার তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। তুমি তোমার সর্বশক্তি দিয়ে অসীম ধৈর্য্যে আলীর ওপর নজর রাখো। আর অল্প দিন—তারপরেই সমস্ত ব্যবস্থা করবো। ওকে দিয়ে আমার কিছু জরুরী কাজ আছে দেলোয়ার, তাই আমার ইচ্ছা আর উপায়ে অনেক ফারাক।

নবাবকে সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে এলো দেলোয়ার, এবার ঘরে ফেরার পালা। ওর মনে হোল নবাব যেন আর কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু বললেন না। হয়তো আরও কিছু দিন বিশ্বাসের কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করতে চান। সামান্য একজন সিপাহী-সর্দ্দারের সাথে নবাবের এত খোলা-মেলা আচরণ সত্যই আশ্চর্য হবার মত ঘটনা। বেগম আখতার বলেছিল, রাজনীতির প্রথম পাঠ নাকি সবার সাথে মেশবার ক্ষমতা, তারপর পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিত্ব, চাতুর্য্য ইত্যাদি, খোদাতালা কি ইকবালকে সবই দিয়েছে?

আপন মনে সারা রাজ্যের ভাবনা নিয়ে বাড়ী পৌছলো সিপাহী সর্দ্দার। তর সইছিল না তার, তড়িঘড়ি পোষাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে আখতারের মহলে গিয়ে হাজির হয়ে অবাক হোল দেলোয়ার, বেদনার্ত স্বরে বলে উঠলো—কি হয়েছে তোমার বেগম, তবিয়ত কি খারাপ নাকি?

—কই না তো!

—তাহলে তোমার এত জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, রুক্ষ চুল, ময়লা পোষাক-পরিচ্ছদ, কি ব্যাপার বল তো!

—না কিছুই হয়নি তো।

আকুল হয়ে উঠলো দেলোয়ার। পাশে বসে হাত জড়িয়ে ধরে বললো—বলনা আখতার কি হয়েছে? কেউ কি ব্যথা দিয়ে কথা বলেছে নাকি?

—না। আমি যদি নিজে থেকে ব্যথা না পাই তবে কে আমায় ব্যথা দেবে। আমি কি কাঁচের পুতুল নাকি যে কথার ব্যথায় ভেঙে যাবো!

—বেশ তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তোমার এরকম বেশ কেন, সে কথার উত্তর কিন্তু এ সব নয়।

—কি হবে উত্তর দিয়ে। যে দুঃখ দিয়ে সুখী হয়, ব্যথা দিয়ে আনন্দ পায়, তার কাছে উত্তর দিয়েই বা কি, আর না দিয়েই বা কি!

—ওঃ তুমি তাহলে এতদিন আমার ওপর রাগ করে বসে আছো!

—না, না, তোমার ওপর রাগ করবো কেন! অধিকার থাকলেই তো রাগের প্রশ্ন, তোমার ওপর কি আমার এমন কোন অধিকার আছে, যার দৌলতে আমি রাগ করতে পারি?

দেলোয়ার মুহূর্ত চুপ করে রইলো তারপর ধরা গলায় বললো—তুমি যদি আমার সমস্ত ঘটনা জানতে বেগম তবে কিছুতেই আমার ওপর অভিমান করে থাকতে পারতে না। কর্তব্য আর বিবেকের দংশন এই দুইয়ে মিলে আমাকে অস্থির করে তুলেছে, তোমাকে ছেড়ে ওখানে থাকতে আমার এক মুহূর্তও ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু উপায় নেই, নবাবের হুকুমে সর্বক্ষণ সেই চরিত্রহীন আলী গওহরের ওপর নজর রাখতে রাখতেই আমার এতগুলো দিন বয়ে গেল। সত্যি বলছি, আর ভাল লাগে না এই চাকরী করতে!

—প্রায়ই বলো এ কথা কিন্তু কসম করে বলতে পারো, এটা তোমার প্রাণের কথা? আমি তো অনেক দিন আগেই তোমাকে বলেছি, তুমি নবাবের গোলামী কর, সেটা আমি চাই না, কিন্তু তুমি কি তা শুনবে!

দেলোয়ার চুপচাপ বেগম আখতারের কথা শুনলো, তারপর আহত স্বরে বললো—আখতার, আমি নবাবের গুলামী করি না, আমি আমার দেশের সেবা করি বলেই একজন সিপাহী সর্দার হয়ে নবাবের সাথে খোলামেলা আলাপ আলোচনা করতে সাহস করি, যা অন্যদের কাছে খোয়াব দেখার মত। বুঝলে।

দেলোয়ারের কথা শুনে অতি দুঃখেও হাসি পেলো বেগম আখতারের। বললো—দ্যাখো, আমরা তো নারী—ছলনাময়ী। কত সহজে আমরা তোমাদের ভাবিয়ে তুলতে পারি, উত্তেজিত করতে পারি, যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। আর তোমরাও কত সহজে আমাদের ফাঁদে পা দিয়ে হাবুডুবু খাও।

—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, ভালবাসি। তাই এই ভালবাসার সুযোগে তুমি যদি আমায় প্রতারিত করে সুখী হও, তবে আমার বলার কিছুই নেই। ধরে নেব ভালবাসার দাম ঠকে ঠকে দিচ্ছি।

দেলোয়ারের কথা বলার ধরনে আহত হোল আখতার বেগম। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এল ওর কাছে, তারপর বললো—তুমি বোঝনা—কেন দুঃখ পাই! জীবনে তোমাকেই পরম রতন বলে জেনেছি, তাই তোমাকে দেখতে না পেলে আমার দুঃখ পানি হয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'চোখের কোণে। তোমাকে তো অনেক বার বলেছি—হীরে-মুক্তা-জহরতে আমার লোভ নেই, আমি শুধু ভালবাসার কাঙাল। শুধু তোমাকে পাবার কাঙাল।

ছলছল করে উঠে বেগম আখতারের চোখ, ভারি হয়ে আসে কণ্ঠস্বর। দেলোয়ার ওর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে! তারপর একসময় আলতো করে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে—মন খারাপ করো না বানু, তুমি যদি চাও তবে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি, তারপর দুজনে ভালবাসার ভেলায় ভেসে সারা জীবন কাটিয়ে দেবো—কি বল খুশী তো?

—না, না, তা কেন! —পুরুষের পৌরুষই তো সব চেয়ে অহংকার। আর তোমার পৌরুষের প্রকাশ তো এই চাকরীতেই। তোমাদের পৌরুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন কঠোরভাবে গর্জে উঠবে, তেমনি অসহায়কে দেবে ভরসা, তবেই তো পুরুষ। তা না করে তুমি যদি শুধু নারীর কাছে বসে ভালবাসার কথা বলো, সে ভালবাসা তো পংগু ক্লীবের ভালবাসা। তাতে মাধুর্য নেই, প্রেমের

মহিমা থেকে সে বিতাড়িত, তাই তো তোমার হৃদয় ভরা ভালবাসা চাই, কাছে থাকতে চাই। এই বিরাট প্রশস্ত হৃদয়ের মাঝে থাকতে চাই চিরজনম ধরে।

হত-বিহ্বল দেলোয়ার হোসেন বেগম আখতার বানুকে জড়িয়ে রাখলো বুকের মাঝে।

আলী গওহর ইকবালের হুকুমে নবাবগঞ্জের শাসন ক্ষমতা পেয়েছে, এ—খবরটা কানে পৌঁছতেই হতভম্ব হোল ফকির আলী রেজা। দুনিয়াটার হোল কি! শেষে কিনা বেইমান লম্পট আলী গওহরের নসীবেই দেওয়ানী! তবে কলুজে আছে আলী সাহেবের, স্বয়ং মুবারকের মত নবাবের বেগমের সাথে মহব্বত, তারপর চুরি করবার কৌশল, এ সব কম হিম্মতের কথা নয়!

জীবনের অনেকদিন তো আশমানতারার খোয়াব দেখে কাট্‌লো, আর ফকিরী জীবনের দরকার কি? না আছে আশমানতারা না আছে তার মহব্বৎ। অতীতের কথা মনে হতেই বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো আলী রেজার।

ফকিরী ঝুলি ঝাম্পা ফেলে দাড়িগোঁফ ছেঁটে বিলকুল কেতাদুরস্ত পোষাক পরলো অনেক দিন পর। আঃ কি গভীর পরিতৃপ্তি! কেন যে বুদ্ধুর মত একটা জেনানার জন্য জিন্দগী বরবাদ করতে বসেছিল। সে কথা মনে হতেই হাসি পায় তার। তার চেয়ে এদ্দিন অন্য কারো পিছে লাগতো, তাহলে হয়তো হিল্লে হয়ে যেতো একটা, হয়তো বা বরাতে বেগম আর দেওয়ানীও জুটতো আলী গওহরের মত। অকারণে আলী গওহরের ওপর বিষণ্ণ হয়ে উঠলো আলী রেজার মন, তবু তার সাথেই দেখা করবার জন্যে সোজা গিয়ে হাজির হোল নবাবগঞ্জের নবাববাড়ীতে। যেখানে নবাব শাহানশার প্রতিভূর দেওয়ান সাহেব আলী গওহর বিশ্রামে রত।

রতনে রতন চেনে, তাই আলী রেজাকে চিনতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব

হোলনা আলী গওহরের, মিষ্টি হেসে বললো—কি আলী রেজা, ইনামের ঝুলিঝাম্পা ফেলে হঠাৎ বিলকুল সাফ্ দেখছি। কি ব্যাপার, অন্য কোন মতলব নেই তো?

খ্যাঁকশিয়ালের মত ধূর্ত হাসি হাসলো রেজা, তারপর বললো—ভিখ-মাঙ্গা মানুষ আমি, আপনার দরজায় এলাম। হুজুর যদি মেহেরবানী করেন তো হুজুরের পায়ের ঘুংরু হয়ে থাকি, জিন্দগীটা এখানেই বিতিয়ে দি, এই আর কি।

অনেক দিন পর পুরানো লোকের তোষামোদ বড় ভাল লাগলো আলী গওহরের। হাজার হোক আশমানতারার ভাই তো, গওহর রেজাকে আশ্বস্ত করে বললো—ঠিক আছে রেজা, কুছ পরোয়া নেই। খানা-পিনা কর, তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে।

খুশীতে ডগমগ হয়ে বহুৎবার সেলাম জানালো আলী রেজা।

ঘুম নেই দেলোয়ার হোসেনের চোখে। একদিকে মালিক ইকবালের অনুরোধমাখা আদেশ, অপর দিকে বেগম আখতার বানুর অনুপস্থিতি। আখতার বানুকে নবাবগঞ্জে আনতেও চেয়েছিল দেলোয়ার, কিন্তু বড্ড একরোখা মেয়ে। হৈ-হল্লা কলরব থেকে দূরে শান্ত পল্লীর ইদগাহাতেই ওর যেন সমস্ত তৃপ্তি লুকাইত। এদিকে আলী গওহর যেন দিনের পর দিন ক্ষমতার লোভে হিংস্র হয়ে উঠেছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সম্মানিতদের ডেকে ডেকে অপমান করছে, স্বেচ্ছাচারীর মত নূতন নূতন হুকুম জারি করছে। ফলে বিক্ষোভ দিনের পর দিন তীব্রতরই হচ্ছে, সমস্যা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই।

দেলোয়ার হোসেন লক্ষ্য করলো আলী গওহর সম্প্রতি দু'চার জন নূতন উমেদার নিয়ে সর্ব্বক্ষণ মৌজ করে দিন কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাঈজীদের নিয়ে মুজরো গানের আসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন বেলেল্লাপনারও বাদ নেই। ক্ষমতার লোভ কি মানুষকে

এত নীচে নামাতে পারে। মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করে দেলোয়ার, কি বিচিত্র এই দুনিয়াটা। আর সব চেয়ে বিচিত্র এই মানুষ জাত। অন্যের দয়ায় যার উত্থান পতন, সেও কিনা মুহূর্তের লোভে নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান বলে ভাবতে দ্বিধা করে না।

মাস কয়েক কাটতে না কাটতে কারণে অকারণে প্রায়ই মত-বিরোধ দেখা দিল আলী গওহরের সাথে। প্রথম প্রথম দেলোয়ারের মতামত গ্রহণ করলেও শেষের দিকে আর কোন ব্যাপারেই আমল দিতে চাইলো না দেলোয়ারকে। এমন কি দেলোয়ার হোসেনের নির্দ্ধারিত কাজেও হস্তক্ষেপ করতে লাগলো আলী গওহর। মরীয়া হয়ে উঠলো দেলোয়ার, আলী গওহরকে সরাসরি জানিয়ে দিল সে, নবাব ইকবালের নির্দ্দেশে এখানে কাজ করতে এসেছে, তার কাজে সে কিংবা যদি কেউ বাধা দেয়, তবে তার পরিণাম ভয়াবহ। একথা মনে রেখেই যেন আলী গওহর তার নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে।

দেলোয়ারের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আলী গওহর। তার উমেদাররা সক্রোধে আক্রমণ করতে ছুটে এলো দেলোয়ারকে, কিন্তু তার দীপ্ত অসমসাহসিক ভংগিমায় শেষ পর্যন্ত তর্জ্জন-গর্জ্জনই সার হোল। দেলোয়ার সেই দিনই রওনা হোল নবাব ইকবালের সাথে দেখা করতে পেয়াসবাড়ীর নবাব মঞ্জিলে।

বিষণ্ণ বিকেল।

সারা আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা, স্তূপাকৃতি লাল মেঘের অবাধ বিচরণ সমস্ত দিগন্ত ঘিরে। ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ, এখুনি হয়তো গাছপালা কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বৃষ্টি নামবে।

প্রাক্তন নবাব হুসামুদ্দিন পাণ্ডুয়ার মহলে বসে দূরের মসজিদের গম্বুজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আকাশে ছবি দেখছিলেন, হঠাৎ কন্যা জিন্নাত্তি কাছে এসে শুধালো—কি ছাখছো আব্বাজান ?

—কি আর দেখবো বেটি, নিজের নসীব দেখছি।

মেয়েকে সস্নেহে কাছে বসিয়ে বল্লেন—দেখছিস না আশমানটা লালে লাল হয়ে উঠছে, ঝড় উঠবে।

—তোমার কি ভয় হচ্ছে আব্বাজান ?

—নারে বেটি, ভয় নয়। ভয়কে আমি আমার জীবন থেকে নির্ব্বাসিত করেছি। দুঃখকে গলা টিপে খতম করেছি, শুধু কিছু ব্যথা কিছু বেদনার সাথে কিছুতেই পারছি না। লড়ে লড়ে এখন ক্লান্ত বোধ করছি বেটি। বয়স তো কম হোল না, নবাবী এলো দুদিনের জন্য, না পারলাম তোদের মুখে হাসির ঝিলিক ফোটাতে, না পারলাম আমাদের হতভাগ্য প্রজাদের সেবা করতে। সবই নসীব, নসীবে না থাকলে কি আর এমনি পরের দোরে দোরে জীবন সংশয় করে বাঁচতে হয় ?

—আব্বাজান, অতীতের দিকে তাকিয়ে তোমার এত আফশোষ কেন! আমাদের চেয়ে গরীবানায় কি দুনিয়ার আর কোন মানুষ নেই ? সব সময় উঁচুর দিকে তাকালে কি করে চলবে আব্বাজান, নীচেও তো দেখতে হয়। আর তাছাড়া তোমার ভেঙ্গে পড়ার তো কিছু নেই, এখনও প্রচুর সময় আর অখণ্ড অবসর। এখনও প্রজারা তোমাকে ভালবাসে, সেলাম জানায়, তুমি যখন দুশমনের মুখোমুখী দাঁড়িয়েলড়তে ভয় পাওনা, তখন কিছুদিন সময়ের জন্য অপেক্ষা তো করতেই হবে, তাই না।

মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানায় নবাব হুসামুদ্দিন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বাইরে বেরিয়ে আসে, কিশোরী কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক সুখ-স্মৃতি মনের কোণে এসে ভিড় করে।

হৃদয়ের পাঁজরের মত সযতনে সিংহাসনকে রক্ষা করছিলেন তিনি। নকীব, উজীর, উলেমা সব্বাই বলতো হুজুর—মেহেরবান, হুজুর জাঁহাপনা। তিনি নিজেও চিরদিন আল্লাহতালার দোয়ার ওপর অগাধ বিশ্বাস করে এসেছেন, কিন্তু কি হোল জীবনে, সুখের দিনে যারা সব সময় কাছে থাকতো, খুশ-খুশীয়ালীর ভাগ নিত,

তারাও দুঃসময়ে সরে গেল। রাজ্য গেল, মান গেল, নবাবীয়ানার সাথে সাথে ইজ্জতও ধূলায় লুণ্ঠিত হোল।

—কি ভাবছো আব্বাজান?

জিন্নাতির প্রশ্নে চমক ভাঙ্গলো নবাব সাহেবের। সত্যিই তো কি ভাবছিলেন তিনি। কিই বা লাভ! এ তো শুধু অতীতের চর্ব্বিত চর্ব্বন। জিন্নাতির দিকে তাকিয়ে বল্লেন—আচ্ছা, বেটি, তোর মার কথা তোর ইয়াদ আছে? মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় জিন্নাতি।—কেন থাকবে না আব্বাজান, আম্মাজান আমাকে কত আদর করতো, সোহাগ করতো, সব সময় বলতো—তুই আমার জান্, তুই আমার কলিজা। দু'চোখ ছল ছল করে ওঠে জিন্নাতির। নবাব হুসামুদ্দিন বলে—তোর আম্মাজান আমাদের ছেড়ে চলে গিয়ে খুব ভালই করেছে বেটি, থাকলে এত কষ্ট চোখে দেখতে পারতো না। দেখছিস না পেঁচার মত দিনের আলোয় বন্দী আমরা, তার চেয়ে আমিও যদি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারতাম তবেই ভাল হোত।

—না আব্বাজান, ও কথা তুমি বলোনা। এত নিষ্ঠুর হয়োনা তুমি। আমার কথা কি একবারও তোমার মনে হয় না। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে কিশোরী, হুসামুদ্দিন কাছে টেনে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তাই তো আজও বেঁচে আছি বেটি। তোর স্নেহ ভালবাসা সব সময় আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে রাখে। তোর মুখের দিকে চেয়েই তো আজো আশা প্রদীপের দিকে চেয়ে আছি, দেখি আর কবে আল্লাহতালা রহম করেন, কবে সেই সুখের দিন আসবে যেদিন তোকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবো।

জিন্নাতি ছলছল চোখে আব্বাজানের কাছে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

দেলোয়ার পেয়াসবাড়ীতে পৌছে মালিক ইকবালের কাছে অকপটে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে ছুটি চাইলো ইকবালের কাছে।

বললো—হুজুর, গোস্তাকি মাফ করবেন, অনেকদিন আপনার নিমক খেয়েছি, তাই আপনার সাথে বেইমানি করতে পারবো না, আমাকে এবার ছুটি দিন।

—এ কি কথা বলছো দেলোয়ার, আমি তোমাকে স্নেহ করি, মিথ্যে আমার ওপর অভিমান করে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকা সত্ত্বেও তুমি ছুটি চাইছ ?

—জী জনাব, মালিকের সাথে বেইমানি করে আমি নোকরি করি না, এই যে দেখছেন আমার দুটি হাত, এই হাত আর আমার ইমান আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আলী গওহরের মত নীচ মানুষের সাথে কাজ করতে আমি কিছুতেই রাজী নই নবাব সাহেব।

—দেলোয়ার জহুরী দেখেছ! যারা মণি মুক্তো ঝুটা কিংবা সাচ্চা তার পরীক্ষা করে, আমিও তেমনি সাচ্চা আর ঝুটা পরখ করছিলাম! আসলি-নকলি আমার জানা হয়ে গেছে দেলোয়ার, এবার শুধু দর-দস্তুরের ব্যাপার!

খানিকক্ষণ চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকলো মালিক ইকবাল, তারপর বললো—তুমি নবাবগঞ্জে ফিরে যাও দেলোয়ার। দু'দিনের মধ্যে আমি ওখানে যাচ্ছি, আর আমার যাবার কথা আর যেন কেউ জানতে না পারে।

সেলাম জানিয়ে আবার নবাবগঞ্জে ফিরলো দেলোয়ার। আবার কোন্ ঝক্কি ঝামেলা হবে কে জানে। তার চেয়ে এই সব দিকদারী থেকে ছুটি নিলেই সবচেয়ে ভাল হতো, কিন্তু হায়রে নসীব, কে ছাড়ছে তাকে।

আখতার বানু ঠিকই বলেছিল—মানুষ নাকি তকদীরের গুলাম, নসীবের ওপর খোদাতালাহ যে কলম চালিয়েছেন তাকে খণ্ডন করবে কে!

আজকাল কি যে হয়েছে দেলোয়ারের, সব সময় আখতার বানুর

কথা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ওর চিন্তা আর কল্পনাতেই বিভোর হয়ে থাকে সারাক্ষণ। আখতার বান্নু যদি ওর মনের ভেতরটা দেখতে পেতো তা হোলে ভীষণ অবাক হয়ে যেতো, ভাবতো—দেলোয়ারের মত আর কেউ কোনদিন কোন নারীকে এত ভালবাসতে পারতো না, কিছুতেই না।

নবাব ইকবাল দু'দিনের মাথায় নবাবগঞ্জে হঠাৎ এসে হাজির, সাথে বেশ কিছু লোকজন। হতভম্ব আলী গওহর, কি ব্যাপার! নবাব সাহেব কোন এত্তেলা না পাঠিয়েই সরাসরি হাজির হয়েছেন। এ বড় তাজ্জব বাৎ। অথচ এদিকে হুজুরের খিদমতের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই, আলী গওহর মহা ফাঁপরে পড়লেন, বিশেষ করে কোন ভাল বাঈজীর ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই।

মালিক ইকবাল এক সাথে আলী গওহর আর দেলোয়ার হোসেনকে ডেকে পাঠালেন মজলিশ মহলে, জানতে চাইলেন রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা। আলী গওহর সবিস্তারে এলাকার উন্নতির ফিরিস্তি দিতে গিয়ে এমন কতগুলো মিথ্যের আশ্রয় নিলো যখন দেলোয়ার আর চুপ করে থাকতে পারলো না, আলোচনা বচসায় পর্য্যবসিত হোল।

মালিক ইকবাল দেলোয়ারের কাছে প্রকৃত বিরোধের কারণ ও অন্যান্য ঘটনা শুনতে চাইলেন এবং এলাকার তামাম ওমরাহ রসিলদারদের কাছে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য আহ্বান জানালেন। সব্বাইকে এত্তেলা দিয়ে পাঠালেন হাজির হবার জন্যে। নবাবের সাথে এসে দেখা করলো অনেকে। সবার মুখেই আলী গওহরের অপদার্থতার অভিযোগ শোনা গেল, বিশেষ তার অর্থগৃধ্নুতার কথা সাধারণ প্রজাদের কাছে বিশেষভাবে প্রচারিত।

নবাব ইকবাল সমস্ত শুনে আলী গওহরের বিরুদ্ধে কঠোর সাজার কথা ঘোষণা করতেই পা জড়িয়ে ধরলো সে। শেষ পর্যন্ত জীবন ভিক্ষার প্রার্থনা জানিয়ে, সেই দিনই নবাবগঞ্জের চৌহদ্দী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে গেল অজানা এলাকায়।

নবাব ইকবাল দেলোয়ারকে এলাকার শাসনকার্যের ভার দিতে চাইতেই আপত্তি জানালো সে। ধীর কণ্ঠে বললো—জাঁহাপনা আমি সামান্য সেনাপতি, আমাকে সেই কাজেই বহাল রাখুন মেহেরবান।

স্মিত হাসলেন নবাব সাহেব। তারপর বললেন—

—দেলোয়ার তুমি অত্যন্ত চতুর, ভেবেছো আমার ওপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে তুমি অত্যন্ত নিরাপদে বসবাস করবে—তা কিছুতেই সম্ভব নয় দেলোয়ার। তোমাকেই আমার প্রয়োজন। ছনিয়ার চারদিকে তাকিয়ে দেখছো না, লোভের শেয়ালগুলো সব সময় একটু উচ্ছিষ্টের লোভে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তুমি সুযোগ পেয়েও নিতে চাইছো না! তুমি বড় ভাল মানুষ দেলোয়ার, তুমি সাচ্চা ইনসান, তাই তুমি সবচেয়ে বড় বুদ্ধু—সবচেয়ে বেশী বোকা। নবাব ইকবাল নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলেন পরম পরিতৃপ্তিতে।

ইকবাল সমস্ত দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন দেলোয়ারকে আর বিশেষ করে সাবধান থাকতে বল্লেন আলী গওহরের ব্যাপারে। চোট খাওয়া কুকুরের রাগ বেশী একথা যেন সব সময় মনে রাখে দেলোয়ার।

ছনিয়াটা সত্যিই তাজ্জব জায়গা। যারা স্বার্থের আশায় সর্ব্বক্ষণ হা-পিত্যেশ করে আছে, তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা। আর যে মুক্তি চায়, নিশ্চিন্ত জীবন চায়, সমস্ত লালসাগুলো তাকেই ঘিরে ধরে অক্টোপাশের মত।

দেলোয়ার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললো। তামাম মুল্লুকের বিচক্ষণ মানুষদের ডেকে রাজ্য শাসনের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করে ধনী-গরীবের ভেদাভেদ যত কমিয়ে আনা যায়, তার জন্য জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো আপন মনে।

এ সব ব্যাপারে আখতার বানুর বুদ্ধিও খেলে ভাল। জেনানা হলে কি হবে। বুদ্ধি ধরে নূরজাহানের মত। সময় সময় এমন বুদ্ধির কথা বলে যে অনেক শাহানশা বাদশার পর্যন্ত বেশ কিছু দিন ধরে চিন্তা করতে হয়।

দেলোয়ার নবাবগঞ্জে নূতন করে সংসার পাততে চাইলে আখতার বানু কি রাজী হবে। সহজে খুশী হবার মত জেনানা নয় সে, হয়তো বলে বসবে—ও সব রাজ্যপাট কাঁচের মত ঠুনকো, একটু ঘা সইতে পারে না—মুহূর্ত্তে খান খান হয়ে যায়। দেলোয়ার নিশ্চিন্ত হয়ে মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছিল কিন্তু অধিকতর দায়িত্ব ওকে আরো বেশী ভাবনায় ফেললো।

এদিকে ক্ষোভে-দুঃখে-লজ্জায়-অপমানে গা রি রি করছিল আলী গওহরের। এত বড় স্পর্ধা ইকবালের, দুদিনের মুরুব্বি হয়েই এত লোকের সামনে তাকে অপমান। এ অপমানের বদলা না নিলে তার আলী গওহর নামই মিথ্যে। কিন্তু কি করা যায়! আলী গওহর আলী রেজা সহ অনেক চিন্তা করার পর শাহানশা নবাব আলীমর্দ্দানের কাছে যাওয়াই স্থির করে রওনা হোল লক্ষৌতিতে।

তখন বিকেল। নবাব শাহানশা সবে মাত্র নবাব মঞ্জিলে এসে বসেছেন। সম্মুখে কিছু সামান্য লোকজন। এমন সময় আলী গওহর আলী রেজা সহ নবাব শাহানশা বাদশাহের কাছে সেলাম জানিয়ে উপস্থিত হতেই ঘিরে ধরলো ওয়াজিররা, কি ব্যাপার, হঠাৎ নবাব শাহানশার কাছে কেন! কিন্তু আলী গওহর চীৎকার করে হুজুরের কাছে তার বক্তব্য পেশ করার মিনতি করতেই নবাব ইংগিতে অনুমতি দিলেন।

দীর্ঘ সময় ধরে আলী গওহর মালিক ইকবালের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যে অভিযোগের নালিশ করতেই অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন শাহানশা আলীমর্দ্দান, গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করলেন—আমার সম্মুখে এসে আমারি ওমরাহের বিরুদ্ধে নালিশ! কুত্তা কাঁহাকা, বেতমিজ বেইমান!

নবাবের ইংগিতে এগিয়ে এলো রক্ষী বাহিনী, হাতে তাদের উদ্যত তলোয়ার। আর্ত্ত চীৎকার করে উঠলো আলী গওহর, আলী রেজা ততক্ষণে সম্মুখের ভিড়ে অন্যত্র পালিয়ে বেঁচেছে আর আলী গওহরকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে চলেছে রক্ষী দল।

ওয়াজীর সাহেব নবাবের ইচ্ছার কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। যারা হুজুরের সামনে তার ওমরাহের বিরুদ্ধে ঝুটা বলে, তাদের একমাত্র শাস্তি কোতল।

কথা শুনে মুহূর্ত্তে ঘেমে উঠলো আলী গওহর, তারপর অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, নবাব শাহানশা আলীমর্দ্দান যখন হুকুম করেছেন তখন স্বয়ং খোদাহতালাও তাকে রক্ষা করতে পারবে না, আর হোলও তাই। তলোয়ারের এক আঘাতে আলী গওহরের দুনিয়াদারী খতম হয়ে গেল।

দেলোয়ার হাসি মুখে খবরটা দিলেও আখতার বানু খুশী হতে পারলো না, তবু তাকে নিরুৎসাহ না করে খুশী খুশী মুখ করে বললো—বেশ তো, এতদিন বাঁদী ছিলাম, এবার বেগম হবো!

—তুমি খুশী হওনি আখতার?

—নিশ্চয়ই খুশী হয়েছি। তুমি শাসনকর্ত্তা হয়েছ আর আমি খুশী হবোনা?

—তবে তুমি যে বলতে তোমার এ সব ঐশ্বর্য্য, বিলাস, যুদ্ধ, খুন-খারাপী ভাল লাগে না!

—তুমি ও সব না করলেই ভাল লাগবে।

—বারে তা হয় নাকি! রাজ্য শাসনে যেমন দয়া মায়ার স্থান আছে, তেমনি হত্যা, নিষ্ঠুরতার প্রয়োজনও খুব বেশী। করুণার স্রোতে যদি ন্যায়-নীতি, কঠোরতা, ভাসিয়ে দেয়া যায়, তাহলে প্রকৃতভাবে রাজ্য শাসন করা যায় না বানু।

দেলোয়ারের কথা শুনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো আখতার, বললো:

—বাঃ পদের তো দারুণ গুণ দেখছি।

—কি রকম!

—এই যে ক্ষমতা পেতে না পেতেই কি চমৎকার বক্তৃতা দিতে

আরম্ভ করেছ। ন্যায়-নীতি, কঠোরতা, করুণা এই সব বড় বড় গাল ভরা কথা বলতে আরম্ভ করেছ!

—কেন কিছু অন্যায় বলেছি নাকি!

—না, না, অন্যায় বলবে কেন। বলছিলাম কঠোর হয়ে—নিষ্ঠুর হয়ে রাজ্য শাসন হয়তো করা যায়, কিন্তু প্রজাদের মনে স্থান পাওয়া যায় না। অন্যান্যদের মত তুমিও যদি সর্ব্বক্ষণ তোমার ইয়ার দোস্তদের নিয়ে সরাবীতে মশগুল থাকো, আর মাঝে মাঝে আইনের নামে কঠোরতা অবলম্বন করে প্রজাদের ওপর অত্যাচার কর, তাহলে তোমার স্থান ঐ পাথরের মসনদেই হবে—তারপর একদিন ফুরিয়ে যাবে অন্যান্য বাদশা-নবাবদের মত। সেজন্যই বলছিলাম —বাদশাহী করা, নবাবীয়ানা করা তোমার সাজে না। যেখানে শাসন সেখানেই ব্যভিচার, যেখানে শক্তি সেখানেই সরাবী। কিন্তু তোমার এই নূতন উদ্যম আমি নষ্ট করে দিতে চাই না দেলোয়ার আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমার ঐশ্বর্য্যে লোভ নেই। মসনদের বাসনা নেই, আমি শুধু তোমাকে চাই, সারা দিনমানের শেষে শুধু একবার তুমি আমাকে দেখা দিয়ে যেও, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো। মনে রেখো তুমি, এক অভাগী জেনানাকে ঠাঁই দিয়েছ। তুমি ছাড়া তার আর কেউ নেই, তাকে যেন ভুলে যেওনা।

গলার স্বর কেমন যেন কেঁপে উঠলো আখতার বানুর, দু'চোখ ঝাঁপিয়ে চিক চিক করে উঠলো পানি। একটা আশঙ্কা যেন তার কানে কানে এসে বলেছিল—দেলোয়ার দূরে সরে যাচ্ছে—অনেক দূরে। হতভম্ব দেলোয়ার আখতার বানুর কথাবার্তা শুনে, আচরণ দেখে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেল। হাত দুটি জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বললো—তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছো না বানু। তুমি একথা ভাবতে পারছো যে, আমি তোমাকে ভুলে যেতে পারি, কিংবা কোন অবিচার করতে পারি!

—না, তা পারনা।

—তবে এ দ্বিধা কেন বানু?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো আখতার। মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তপ্ত স্বরে বললো—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি দেলোয়ার, তবু যেন কে আমায় বার বার অবুঝ হতে বলছে, অবিশ্বাসী হতে বলছে। আমি আর পারছি না দেলোয়ার, আমি আর মনের সাথে যুদ্ধ করতে পারছি না, না—না।

দেলোয়ার দু'চোখের আঁশু মুছিয়ে দিল আখতার বানুর। পাশে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো—তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে না?

—কোথায়?

—নবাবগঞ্জের মহলে। সেখানে তুমি আমি নয়া সংসার গড়ে তুলবো, আমি হবো তোমার বাদশা আর তুমি আমার পেয়ারের বেগম। না, না। অহংকার বিলাসের বাদশা নয়। হবো মানুষের ভালবাসা আর মোহব্বতের প্রীতির সওদাগর। ঠিক যেমনটি তুমি চেয়েছিলে—তাই না?

অশ্রু-ভেজা চোখে মিষ্টি হেসে আখতার বললো—আমি তো কবি, ভাবুক, প্রেমিক দেলোয়ারের বেগম হয়েই আছি, আর চির দিনই থাকবো। আমি নবাব, শাহানসা হুজুরের বেগম হতে চাই না—হবোও না কোন দিন। কথা শেষ করে আবার হেসে উঠলো আখতার বানু।

আলী গওহরের হত্যার খবরটা কানে পৌঁছতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল দেলোয়ারের। ওর সংশোধন চেয়েছিল সে—মৌত চায়নি। কিন্তু উপায় কি, এদেশে তো সব কিছুতেই কাজীর বিচার। নবাব শাহানশা আলীমর্দ্দান যখন স্বয়ং হুকুম দিয়েছেন তখন কার ঘাড়ে কটা মাথা যে সে আদেশ অমান্য করবে!

বিচিত্র মানুষ এই নবাব আলীমর্দ্দান! দেলোয়ারের মাঝে মাঝে মনে হয় শাহানশা বোধ হয় আংশিক উন্মাদ কিংবা অপ্রকৃতিস্থ।

তা না হোলে এমন সব উদ্ভট কাণ্ড করে! তাই বা কি করে হয়, জ্ঞানের নাড়ি তো আবার দারুণ টনটনে। নবাব আলীমর্দ্দানের কথা শুনলে কেমন বিরক্তি ধরে দেলোয়ারের, নামটা শুনলেই যেন জ্বালা ধরে। ফেরেপ বাজ নবাব এই আলীমর্দ্দান।

দেলোয়ার মহলে এসে আলী গওহরের খবরটা দিল আখতার বানুকে, বললো—জানো, নবাব সাহেবের নাম শুনলেই আমার যেন কেমন একটা বিরক্তি আসে। মনে হয় এই মানুষটা যেন তামাম দুনিয়ার মানুষের সাথে দুশমনী করার জন্যই জন্মেছে।

আখতার বানু কোন উত্তর দিল না। নীরবে দেলোয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যে বোঝাতে চাইলো তা সেই জানে। ওকে আর ঘাঁটানো উচিৎ হবে না মনে করে দেলোয়ার ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল মহল থেকে।

এখন অনেক কাজ বেড়েছে, প্রজাদের ভয় ভাঙ্গাতে হবে। নবাব দরবারকে সাধারণের নাগালের কাছে বলে বিশ্বাস করাতে হবে, তাদের সুখ দুঃখের কথা যেন এসে অকপটে বলতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে প্রজাদের ওপর যে অত্যাচার চলেছে, নিপীড়ন হয়েছে তার আর পুনরাবৃত্তি হবে না একথা বিশ্বাস করাতে হবে প্রজাদের। দেলোয়ার এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলো। ইকবালের অনুমতি না নিয়েই গাজী সাহেবকে দাওয়াৎ করে বসলো নিজের মহলে। সব চেয়ে জ্ঞানী, প্রজাদের পীর সদৃশ এই বৃদ্ধকে এনে কিছু উপদেশ, নির্দ্দেশ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। যদিও জানেন এতে একটা বিপদ আসা অস্বাভাবিক নয়। শুধু ইকবালই নয়, স্বয়ং শাহানশা আলীমর্দ্দানও ক্ষুব্ধ হবেন। হয়তো যখন জানবেন তার চির দুশমন গাজী সাহেব সলা-পরামর্শ করে গেছে নবাবগঞ্জে এসে, স্বয়ং দেলোয়ারের বাড়ীতে।

বিশ্বস্ত লোক মারফৎ খবর গেল গাজী সাহেবের কাছে—নয়া শাসনকর্ত্তা এক নূতন যুবক। সে নাকি মোলাকাৎ করতে চায় তার সাথে। ব্যাপার কি! এর পেছনে আবার কোন চক্রান্ত

নেই তো। পক্ককেশ বৃদ্ধ গাজী সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করে ব্যাপারটাকে ভাবতে চেষ্টা করলেন এবং অসম সাহসে দেলোয়ার হোসেনের দাওয়াৎ গ্রহণ করলেন।

ব্যাপারটা পছন্দ হোল না নবাব হুসামুদ্দিন সাহেবের, দুশমনের ভাল মানুষীও ভয়াবহ। বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক সংঘাত চলছে ওদের সাথে। নবাব হুসামুদ্দিন বল্লেন—আমার কিন্তু খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না গাজী সাহেব, আপনি বিচক্ষণ মানুষ হয়ে কি করে দুশমনের দাওয়াৎ গ্রহণ করলেন, শেষে যদি গিয়ে বিপদে পড়েন?

মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন গাজী সাহেব—নবাব সাহেব, জবান যখন দিয়েছি, তখন নবাবগঞ্জে যাবো নিশ্চয়ই। আপনি মিছেই আশঙ্কা করছেন, দেলোয়ার হোসেন জানে, সে আমার প্রতিপক্ষ নয়—আমার দুশমন তার মনিব নবাবের নবাব শাহানশা আলীমর্দ্দান।

—হ্যাঁ, সেই জন্যই আশঙ্কা করছি গাজী সাহেব। আপনার ক্ষতি হোলে ওর মনিবেরই তো লাভ।

—আপনার আশঙ্কা অমূলক বলেই আমার ধারণা। আমি নিজে নবাব নই জাঁহাপনা, কিন্তু অনেক রাজা-বাদশার মসনদ গড়বার-ভাঙ্গবার ইতিহাস আমার জানা আছে। তাই দেলোয়ারের মত চরিত্রের মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না নবাব সাহেব!

—খুব ভাল কথা, আপনি যদি সফল হয়ে শত্রুপুরী থেকে ফিরে আসতে পারেন তাহলেই হোল। যাই করুন না গাজী সাহেব, ইয়াদ রাখবেন, হাত থেকে তীর ছুটে গেলে ওকে আর থামানো যায় না—কি বলেন?

গাজী সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। ভেবে রাখলেন একে বিস্তারিত জানানোর দরকার নেই, প্রয়োজনে জানালেই চলবে। চারদিক থেকে ঘা খেয়ে আর প্রতারিত হয়ে নবাব হুসামুদ্দিন আর কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না, প্রতিটি মানুষ যেন তার কাছে

সন্দেহের সমুদ্র। এই দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস নেই, কারো ভাল করেছেন কি ব্যস্ সেই হয়ে যাবে পয়লা নম্বরের দুষমন। নবাব হুসামুদ্দিনের অতীত আবার তাকে এসে আচ্ছন্ন করলো। সেই নবাবী, মালিকানা, সব যেন আজ আলেয়া—বিলকুল মরীচিকা।

যথারীতি গাজী সাহেব হাজির হলেন দেলোয়ারের কাছে, আদরে আপ্যায়নে অভিভূত হয়ে গেল বৃদ্ধ। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করলেন গাজী সাহেব' এ রাজ্যের ওপর অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়েছে, প্রজারা শংকিত, অনেকে এ দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে ইচ্ছুক। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। ব্যবসাপত্র নষ্ট, কেবল মাত্র কৃষি কাজ ছাড়া আর কিই বা আছে সাধারণ প্রজাদের। অপ্রকৃতিস্থ সম্রাটের খাম-খেয়ালীতে নাগরিক জীবন অতীষ্ঠ। গাজী সাহেব বোঝাতে চাইলেন, আলীমর্দ্দানের পতন ব্যতিরেকে এ রাজ্যের মঙ্গল অসম্ভব।

—তোবা, তোবা, একি কথা বলছেন গাজী সাহেব, তিনি আমাদের শাহানশা। আমরা তার খিদমৎগার মাত্র।

—তা হোক, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার চোখের সামনে অনেক শাহানসা সম্রাটকে রাজত্ব করতে দেখলাম, আমার স্থির বিশ্বাস এই নবাবের পতন না ঘটলে কিছু হবার নয়।

কিছুক্ষণ থামলেন বৃদ্ধ, তারপর দেলোয়ারের চোখের তারায় চোখ রেখে বল্লেন—আপনি যুবক, সাহসী, তদুপরি আপনার দিল আছে, প্রজাদের জন্য অনুভব করেন। যদি সত্যিই প্রজাদের মঙ্গল চান তবে—

—না থাক। সে কথা আর আমাকে বলবেন না গাজী সাহেব। আমি আপনার কাছে শুধু এই সাহায্য প্রার্থনা করছি, যাতে প্রজারা আমাকে কিছুদিন কাজ করবার সুযোগ দেয়। তারপর যদি অযোগ্য মনে করে, তখন তারা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আপনি শুধু কিছু দিন তাদের ধৈর্য্য ধরতে বলুন, বকেয়া খাজনাপত্র দিতে উপদেশ দিন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি গাজী সাহেব, তিনমাসের

মধ্যে আমি আপনাদের সুশাসন উপহার দিতে পারবো। অবিশ্যি আপনিই আমাকে সর্ব্বক্ষণ সংবুদ্ধি পরামর্শ দেবেন।

গাজী সাহেব গম্ভীর হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বল্লেন—আপনার আন্তরিক সৎ প্রচেষ্টায় আমার দিল খুশীতে মজবুর হয়ে গেল হোসেন সাহেব। আমি জবান দিচ্ছি, আপনাকে সব সময় সাহায্য করতে কসুর করবো না, লেকিন একটা জবান আপনাকেও দিতে হবে···

—কি?

—যদি প্রজাদের সুখ-সুবিধা না দিতে পারেন, যদি আলীমর্দ্দানের সৈন্যরা ঠিক আগের মতন জোর জুলুম করে মানুষের লোকসান করে, জেনানার ইজ্জত নষ্ট করে, তবে আপনি ইসলামের নামে কসম করুন, সেই দিন আপনি নবাব শাহানশা আলীমর্দ্দানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন?

দেলোয়ারকে নিশ্চুপ দেখে বৃদ্ধ আবার বল্লেন—কি হোসেন সাহেব, এত বড় দিল-এর মানুষ হয়ে লোভের পদকে অবহেলায় দূরে ফেলে দিতে পারবেন না? জেনানার ইজ্জত রক্ষার জন্য ইনসানের ডাকে সাড়া দিতে পারবেন না?

—আমাকে আর উত্তেজিত করবেন না গাজী সাহেব। জবান দিলাম, যদি জেনানার ইজ্জত রক্ষা করতে না পারি তবে এই গদীতে আর বসবো না।

—আর প্রতিশোধ!

—জী হ্যাঁ, দরকার হলে সে সময় আমি অবশ্যই আপনার পাশে এসে দাঁড়াব।

—বহুৎ আচ্ছা বহুত সুক্রিয়া।

ধীরে ধীরে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দেলোয়ার হোসেনের সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ গাজী সাহেব। বলিষ্ঠ শক্ত-সমর্থ মানুষটার দিকে তাকিয়ে ওর দেশ-প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে শ্রদ্ধায় আপনি মাথা নুইয়ে এলো দেলোয়ারের।

অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনেই বললো—খোদা এই সমস্ত মানুষের ভাল কর। দোয়া কর, যেন সমস্ত মানুষের মঙ্গল করতে পারি। হাসি ফোটাতে পারি দুঃখীর মুখে। অন্ধেরাকে যেন উজালায় রূপান্তরিত করতে পারি।

লক্ষ্মৌতি রাজ্যের শেষ সীমায়, খাজা নাসিমউদ্দিন চিস্তির দরগাহে এবার খুব জৌলুস—উস পরব। তামাম এলাকার মানুষ দরগাহে এসে ভিড় করেছে, দু'মাস ধরে মেলা চলবে। হাজার হাজার মানুষ চিরাগ জ্বালিয়ে প্রাণের একান্ত প্রার্থনা জানাবে এই দরগাহে।

কি মর্জ্জি হয়েছে শাহানশার—তা আল্লাই জানে! মেলায় জোরদার জৌলুশ করবার জন্য জোর মদৎ দিয়েছেন, দিয়েছেন প্রচুর টাকা পয়সা।

আরব, বাগদাদ তেহেরান থেকে শুরু করে তামাম মুল্লুক থেকে হাজির হয়েছে উলেমা, গাজী, কাজী, মৌলভী মোল্লার দল। অসংখ্য তাঁবু পড়েছে মেলায়। যাদু-সার্কাস, মহফিলে জমজমাট করছে মেলার ময়দান।

উস পরবের খবরটা আগেই এসেছিল আখতার বানুর কাছে। দেলোয়ার নূতন করে খবরটা দিতেই খুশীয়ালীতে নেচে উঠলো তার মন, সোহাগ ভরে বললো—আমারও খুব ইচ্ছে করছে যেতে।

—বেশ তো, যাও না বেড়িয়ে এসো।

—তুমি নিয়ে যাবে তো?

—আমার অত ধর্মে কর্মে মতি নেই বানু, আমার সমস্ত কিছু তোমার কাছেই সমর্পণ করেছি।

—যাঃ!

—তা ছাড়া আর কি বলবো, তুমি তো জান, মরবার পর্যন্ত ফুরসৎ নেই। তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে যেতে বলছো কেন।

—জানি, জানি। আমার কোন সাধ-আহ্লাদের কথা বল্লেই তোমার হাজার হাজার কাজের ফিরিস্তির কথা মনে পড়ে, তাই না?

—তুমি আমার ওপর অবিচার করছ বানু।

দোলায়ারের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো আখতার, তারপর বললো—ঠিক আছে নবাব সাহেব, আপনাকে কিছু করতে হবে না, যা করার আমিই করবো।

—না-না, তা আপনাকে করতে হবে না বেগম সাহেবা, আমি সব পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দেবো।

মীর্জ্জা বরকত আলীখানের সাথে আরো কিছু বিশ্বস্ত সিপাহী দিয়ে আখতার বানুকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন দেলোয়ার সাহেব। উস পরবে যাবার ব্যাপারটা গোপন রাখার নির্দ্দেশ দিলেন স্বয়ং আখতার বানু, মাঝে মাঝে অযথা অবচেতন মনে অতীত এসে যেন তার টুঁটি চেপে ধরে, কে যেন এসে বলে—নিজেকে লুকিয়ে রাখবি কতদিন? ধরা তোকে পড়তে হবেই। ভয়ে চোখ বন্ধ করে শিউরে ওঠে আখতার বানু। তাই তো নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায় অতি সন্তর্পণে।

অনেক দূরের পথ।

দেলোয়ারের পার্শ্ব অনুচর মীর্জ্জা বরকত আলীখান আরো কয়েকজন রক্ষীসহ চলেছে আখতার বেগমের সাথে উস পরবে। তার কথা মতই কাজ হয়েছে, কেউ জানবে না তার এই পরবে যাওয়ার সংবাদ—জানলেই ঝামেলা। এককান থেকে সাত কান। তারপর হাজারো গরীব দুঃখী বেওয়ারা ভিড় জমাবে সাহায্যের জন্য। তার চেয়ে নিশ্চুপে দরগাহে চেরাগ জ্বেলে প্রাণের আকুতি জানিয়েই চলে আসবে চুপিসারে।

দেখতে দেখতে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকগুলো দিন কাটলো এখানে। মনের গোপন ইচ্ছাটা মনের মাঝেই গুমরে গুমরে

কাঁদছে, কিছুই হোল না জীবনে, শুধু বয়সের ছাপ দেহে মনে দাগ কেটে চলেছে নিরন্তর। একটি প্রাণোচ্ছল শিশুর অনুপস্থিতিতে জীবনকে এখন অসার-অসহায় লাগছে। ভাবতে ভাবতে দু'চোখ ভরে পানি চলে আসে আখতার বানুর, তবে কি সে সন্তান ধারনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে! তাহোলে এই নারী জীবনের মূল্য কি? শুধু এই বন্ধ্যা দেহ বয়ে বেড়াবার সার্থকতা কোথায়?

পাল্কির ভেতর বসে ভাবনার অক্টোপাশে ঘেমে উঠেছে আখতার বানু। রুক্ষ ধূ-ধূ মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে দেহরক্ষীর দল। ঘোড়ার খুরে খুরে ধূলোয় মলিন দেখাচ্ছে সব্বাইকে। সূর্য্য-ছটায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে বরকত খানের কোষবদ্ধ তরবারী। পুরো একদিন একরাত কেটেছে পথে পথে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মরুভূমির মত রুক্ষ পথটার শেষ হবে। তার পরেই মেলার এলাকা।

অনেকদিন পর হঠাৎ শাহসুজা এরফানের খৎ এসে হাজির।

দীর্ঘ সময় মনের দুঃখে শুধু গাজীসাহেব আর বিশ্বরূপের ভরসায় নিভন্ত প্রদীপের মত টিপটিপ করে জ্বলছিলেন নবাব হুসামুদ্দিন সাহেব। শাহসুজা প্রেরিত খুশ-খবরে যাদু দণ্ডের স্পর্শের মত হঠাৎ দেওয়ানা হয়ে উঠলেন তিনি, সত্যি খোদা যব দেতা হ্যায়— ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা হ্যায়। সেই কবে জওয়ানীতে মহব্বত করতে গিয়ে বেজায় বেইজ্জতে পড়েছিল ছোকরা। হুসামুদ্দিনের তখন অনেক নাম ডাক, সেই দাপটের জোরেই এরফানকে সাহায্য করছিলেন তিনি, তার মহব্বতের সুরাইয়াকে এনে দিয়েছিলেন তার ঘরে। যদিও হুজ্জুত পোয়াতে হয়েছিল, তবু এক নওজোয়ান দেওয়ানীকে মদৎ করেছিলেন নেহাৎই খুশীর মর্জ্জিতে।

সেই অতীতের বীজ আজ ফুল ফুটে ফল প্রসব করেছে। এরফান নাকি এখন নবাবী পেয়েছে। সেপাহী-বরকন্দাজ রূপেয়া-পয়সার কিছুই কমতি নেই। হুসামুদ্দিনের দুর্দ্দিনের দুঃসংবাদ পেয়ে সে

তাকে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে সাহায্য করতে চায়—শুধু অনুমতি প্রার্থনা।

বহুদিন বাদ দিলখোলা হয়ে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন নবাব হুসামুদ্দিন। কে বলে দুনিয়াটা বিশ্বাসঘাতক! বেইমানের আড্ডা খানা! কে বলে ইনসান নেই! নবাবের হাসির শব্দে চমকে উঠে শশব্যস্তে ছুটে আসে জিন্নাতি।

—কি হোল আব্বাজান? হঠাৎ খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠলে, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি হাসতে ভুলে গেছ?

—নারে বেটি না, হাসতে আমি ভুলিনি। এতদিন তো শুধু কেঁদে কেঁদে খোদার কাছে দোয়া ভিক্ষা করেছি, এইবার বুঝি তিনি আমার আরজী মঞ্জুর করেছেন। তা-না হলে এই নিঃসঙ্গ অভিশপ্ত ব্যর্থ জীবনে বেহেস্তের আলোর মত এই খৎ কি করে এলো আমার কাছে। ছাখ্ পড়ে দ্যাখ্ কি লেখা আছে এতে।

চিঠিতে চোখ বুলিয়ে খুশীতে চিক চিক করে উঠলো জিন্নাতির চোখ, তার পর ধীর কণ্ঠে বললো—আব্বাজান, নিঃসন্দেহে এটা সুসংবাদ কিন্তু তুমিই তো শিখিয়েছ—সম্রাট উজীর আমীরদের জীবনে সব সত্য—সত্য নয়। তাই বলছিলাম এখনই খুশীতে এতটা উত্তেজিত হয়ো না, যেখানে অনেক আলো, সেখানেই অন্ধকারের সাম্রাজ্য, আব্বাজান। আগে কাজ হাসিল হোক, তারপর তোমার এই মেহেরবানকে উপযুক্ত ইনাম দিও।

—নারে না, তুই একে ভুল বুঝিস না। বড় সাচ্চা কলিজার ছোকরা এই এরফান। তুর্কীর বাচ্চারা ঝুটা বলে নারে, ঝুটা বলে না।

—নবাব আলীমর্দ্দানও তো তুর্কী বাবা, সেকথা কি ভুলে গেলে?

—নারে ভুলিনি কিছুই, আমি যদ্দুর জানি এই ছোকরা আলীমর্দ্দানেরই জ্ঞাতি আর আলীমর্দ্দানের সাথে বিরোধই আজ আমার সম্মুখে এই সুযোগ এনে দিয়েছে।

—খুব ভাল কথা, কিন্তু নবাবী-সুলতানী সবই তো দাবার চাল।

জুয়ার আসরে যখন নেমেছ তখন তাড়াহুড়া কিসের? আগে পরখ করে ছাখো জহরৎ খাঁটি না রংগীন সূতোয় গাঁথা ঝুটা পাথরের মালা।

কথা শুনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন নবাব সাহেব। একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন—তুই যেন আজ কাল কেমন হয়ে যাচ্ছিস জিন্নাতি, সব কিছুর মধ্যেই তুই শুধু খারাপকে দেখতে পাস, তুই না নবাব শাহানশা হুসামুদ্দিনের বেটি? তোর দিল হবে আশমানের মত বড়, তা-না হয়ে তোর দিল কেমন সন্দেহের বাসা হয়ে উঠছে। এটা কিন্তু ঠিক নয় বেটি।

করুণ হাসি হাসলো জিন্নাতি। কি অদ্ভুত এই আশার ছলনা। নিভন্ত প্রদীপও আবার জোর করে জ্বলে উঠতে চায়—অসহায় মানুষটি অন্যের সাহায্যে বলশালী হতে চায়—নবাবীর খোয়াব দেখে। সত্যি আজব জায়গা এই দুনিয়াটা, আর তার চেয়েও আজব এই সিংহাসনের লোভ। পিতা পুত্রকে হত্যা করে। পুত্র পিতৃরক্তে তলোয়ার রাঙ্গা করে। স্বামী স্ত্রীকে চেনে না। ভাই ভাইকে দুশমন মনে করে—এরই নাম লোভ—এরই নাম নবাবী।

ভাবতে ভাবতে বুকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আসে তার। তাড়াতাড়ি ছাদের ওপরে গিয়ে বিরাট শূন্য গম্ভীর নীল আশমানের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—মেহেরবানী কর সর্ব্বশক্তিমান, আমার আব্বাজানকে মেহেরবানী কর, ওর খোয়াবকে সফল কর খোদা।

বিদ্যুৎ গতিতে খবর পৌঁছে গেল গাজী সাহেবের কাছে। নবাব হুসামুদ্দিন সাহেব তার সাথে সাক্ষাতে ইচ্ছুক। আপনজন বলতে তো একমাত্র তিনিই, তাই তাকে বললে যদি অন্যান্য ব্যাপারগুলো তরান্বিত করেন, এ আশাতেই নবাব সাহেব দিন গুণছেন।

গাজী সাহেব এলেন সাথে বিশ্বরূপ। নবাব হুসামুদ্দিন এরফানের চিঠির বক্তব্য বলে শেষবারের মত গাজী সাহেবকে

উস্কে দিয়ে দেশের, মানুষের ধর্মের ইজ্জতের সওয়াল তুলে ক্ষিপ্ত করে তুলতে চাইলেন এই বৃদ্ধ শার্দ্দুলটিকে। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে কথার তালে তালে অতি ধীরে ধীরে পা দোলাচ্ছিলেন গাজী সাহেব। নবাবের কথা শেষ হতেই বিশ্বরূপের দিকে স্মিত হেসে বললেন—বিশ্বরূপ, সমস্ত দিকের পথ পরিষ্কার। আজকের এই চিঠি যদি সত্যি হয়, তবে তা বাড়তি পাওনা মাত্র। হলেও ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই। এবার যা করবার তা তোমার দায়িত্ব। নেপথ্য নায়কের প্রয়োজন শেষ। এবার মঞ্চে তুমিই প্রধান।

চুপচাপ বসেছিল বিশ্বরূপ। গাজী সাহেবের কথায় ওর মন নূতন করে খুশীতে রাঙ্গা হয়ে উঠলো মুহূর্তে, বললো—আমিও প্রস্তুত গাজীসাহেব, এখন শুধু মওকার অপেক্ষা। একটা সুযোগ পেলেই কেল্লা ফতে করতে পারবো বলে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গাজী সাহেব বিশ্বরূপের চোখের তারায় চোখ রেখে বল্লেন—নও জোয়ান, ইয়াদ রেখো আমীর ওমরাহরা হাওয়াকা তুল্হন। যেদিকে বাতাস সেদিকেই কাৎ। ওদের ওপরে নির্ভর করবে কম, জানো তোমার বাবা বলতেন—বলং বলং বাহু বলং খুব খাঁটি কথা বিশ্বরূপ।

—আপনার সব কথাই আমি ইয়াদ রেখে কাজ করি গাজী সাহেব। নবাব হুসামুদ্দিন খুশীতে ফুলঝুরির মত জ্বলে উঠে বললেন—বিশ্বরূপ, আমি তোমার ওপরেই নির্ভর করে আছি যুবক। মনে রেখো আমার যদি সুদিন আসে তবে তুমিই হবে ঐ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি।

—নবাব সাহেব, দীর্ঘদিন বনে-বনান্তরে লুকিয়ে বসবাস করতে করতে আমি বুনো-জংলী হয়ে গেছি সত্য, কিন্তু আজো আমার মনে মালিন্য-লোভ-লালসা এসে বাসা বাঁধতে পারেনি। একবার যখন আপনাকে কথা দিয়েছি তখন জানবেন জীবনও গচ্ছিত রেখেছি কাজ উদ্ধারের বিনিময়ে! সুতরাং আমাকে রাজা-গজার লোভ দেখিয়ে কি লাভ! ওসব পদ, অর্থ আমার কাছে কাঁচের টুকরোর মতই অর্থহীন!

আরো কিছু বলতে চাইলো বিশ্বরূপ, কিন্তু থামিয়ে দিল গাজী সাহেব, বল্লেন—না, না তুমি নবাব সাহেবকে ভুল বুঝোনা বিশ্বরূপ। তিনি তোমায় স্নেহ করেন বলেই খুশীর আবেগে ও-কথা বলেছেন। লোভের প্রশ্ন নয়। তোমাকে তিনি জীবনের পরম ও চরম মুহূর্তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, সেটাও তো পুত্রাধিক স্নেহ করেন বলেই। তাই এ কথাকে সরল সাধারণভাবেই ভাব না কেন! থতমত খেয়ে ঢোক গিলতে গিলতে নবাব সাহেব বললেন—ঠিক। ঠিক কথাই বিশ্বরূপ, আমি ঐ কথাই বলতে চেয়েছিলাম। তুমি কিছু মনে কোরো না, ঘা খেয়ে খেয়ে জীবনটায় সহস্র ফুটো হয়ে গেছে, তার প্রতি ছিদ্রেই বিষ আর বেদনার পুঁজ জমে আছে। কখন যে কি ভাবি কি বলি পর মুহূর্তে নিজেই কিছু বুঝতে পারিনা, তুমি কিছু মনে কোরো না।

কথা বলতে বলতে হুসেন শা হাত চেপে ধরে বসলেন বিশ্বরূপের।

—না না, আমি কিছুই মনে করি নি নবাব সাহেব। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমতা আমতা করে উত্তর দিল বিশ্বরূপ। নবাবের করুণ অবস্থা দেখে গাজী সাহেবের দুঃখও হয়, হাসিও পায়। জলে ডোবা যেমন মানুষ ছোট্ট খড়ের টুকরো পেলে তাকে জড়িয়ে বাঁচতে চায়—আশ্রয় চায়—হুসামুদ্দিনেরও ঠিক সে অবস্থা। এদের আবার দেশপ্রেম! লোভ লালসার রস আকণ্ঠ পান করে বসে আছে, ক্ষমতা পেলে আবার সেই নবাবী, সেই আমিরী।

গাজী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ বললেন।

—বিশ্বরূপ, আলীমর্দ্দান হয়তো অল্প দিনের মধ্যেই এ সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণে আসবেন, দিন এখনও ধার্য হয়নি, হলে অবশ্য জানতে পারবো। সুতরাং···

গাজী সাহেবের ইংগিতপূর্ণ চোখের চাহনী দেখে উসখুস করে উঠলো বিশ্বরূপ, বললো—আমাকে ঠিক সময় খবরটা একটু দেবেন গাজী সাহেব—তারপর সব দায়িত্ব আমার।

—আমারও সেই কথা। এই মওকায় কাজ হাসিল করতে না পারলে আর কিছু করা যাবে না, বলে উঠলেন গাজী সাহেব।

মনে আশা আকাঙ্ক্ষার সহস্র চেরাগ জ্বেলে এগিয়ে চলেছে জেনানারা। সমস্ত মেলা জুড়ে বোরখার সারি। আখতারবানুও সামিল হয়েছে এদের সাথে—পাশে পাশে রয়েছে বাঁদী নাজমা খাতুন। আজ তার হাতেও চেরাগ।

ছোট্ট জায়গা। অসংখ্য ভিড়। একের পর এক এসে নতজানু হয়ে চেরাগ জ্বেলে দোয়া প্রার্থনায় মগ্ন। আখতারবানু ঘরে ঢুকতেই আপনা থেকে তার দু'চোখে কেন যেন পানি এসে সব কিছু ঝাপসা করে দিল। আল্লাহতালার কাছে মাথা ঝুঁকে বার বার প্রাণের প্রার্থনা জানাল সে। তারপর এমনি হাজারো জেনানার পিছু পিছু দরগাহার বাইরে বেরিয়েই নাজমাকে খুঁজতেই শঙ্কিত হোল একটু, নাজমা কোথায়—নাজমা।

অনেক রাত হয়েছে। দরগাহার ভেতরে খোঁজ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দুশ্চিন্তায় মন চমকে উঠলো বার বার। এমনি সময় হঠাৎ লোকদের ছোটাছুটি, চীৎকার আরম্ভ হয়ে গেল। সমস্ত মেলা জুড়ে সন্ত্রাসের ভাব। কানে এলো কোথা থেকে সিপাহীরা মস্ত বড় ঘোড়া চালিয়ে ছুটে আসছে মেলার মধ্যে। মুহূর্ত্তে প্রলয় ঘটে গেল একটা।

প্রাণের দায়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছিট্‌কে যে যেদিকে পারলো পালাতে চাইলো। বোরখার বাঁধন ছিঁড়ে আখতারবানুও একসময় ছুটতে আরম্ভ করলো দিগবিদিক দিশেহারা হয়ে। হাজারো জেনানার করুণ আর্তনাদ আর বাঁচবার জন্য কি ভীষণ আকুতি আকাশ-বাতাসকে আকুল করে তুললো এক মুহূর্ত্তে। কারা যেন তামাম মেলাকে অন্ধকারের কারাগারে পরিণত করে ফেললো। আর সেই অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে সিপাহীরা সমস্ত কিছু তছনছ করতে

শুরু করলো। প্রাণভয়ে ভীত আখতারবানু সর্ব্বস্ব ফেলে একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করতে চাইলো, থরথর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে, বুকের কাঁপুনী কিছুতেই কমছে না। সেই অতীতের গুলাবী বাঈ আজ মৃত, যে একদিন মৃত্যুকে পরোয়া করতো না, জীবনকে ভাবতো ভোগের সামগ্রী। অজানা পুরুষের বুকে অতি অনায়াসে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করতো না—আজ এই অজানা অচেনা জায়গায় রাত্রির অন্ধকারে ইজ্জতের ভয়ে মৃত্যুভয়ে ঘর-সংসারের মায়ায় দেলোয়ারের ভালবাসা স্মরণ করে ডুকরে কেঁদে উঠলো আখতার-বানু। তারপর এক সময় সহসা ওর খুব কাছাকাছি ঘোড়া থেকে একজন সিপাহীকে নামতে দেখে ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল সে।

রাতারাতি খবরটি ছুটে গেল সর্ব্বত্র। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে চারদিক থেকে অসংখ্য মানুষের জমায়েৎ হোল এখানে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল দেলোয়ার হোসেন। বিস্তর লোক-লস্কর সিপাহীর দল ছুটলো চারদিকে।

মাত্র পঁচিশ ত্রিশ জন ঘোড়সোয়ার তামাম মানুষগুলোকে দলে পিষে তাদের নাকের ডগার ওপরে এতগুলো জেনানাদের ধরে নিয়ে গেল, ইজ্জত নষ্ট করলো, আর এই অসংখ্য ডরপোক মানুষগুলো প্রাণের ভয়ে ইদিক সেদিক পালিয়ে বাঁচলো। সকলে মিলে একবার রুখে দাঁড়াল না—বাধা দিল না। আশ্চর্য! দেলোয়ারের সমস্ত শিরা-উপশিরায় যেন উল্কাপিণ্ড জ্বলে উঠলো। কে এরা বেতমিজের বাচ্চা এই ধর্ম্মস্থানে এসে এরকম নারকীয় অত্যাচার করতে সাহসী হয়!

আখতার বেগমকে পাওয়া যাচ্ছে না, এ খবর নবাব ইকবালের কানে পৌঁছতেই তিনিও সিপাহীদের দিয়ে তামাম মুল্লুক তালাশের ব্যবস্থা করলেন। লোকমুখে জানা গেল সিপাহীরা ঘোড়ার পিঠে জোর করে তুলে জেনানাদের নিয়ে উধাও হয়েছে, তাঁবুগুলো ছিন্ন ভিন্ন করেছে, রোশনীদার বাতিদান ভেঙ্গে চুরমার করেছে। যারা দু-এক জন বিরোধীতা করতে এসেছিল তাদের খতম করেছে।

শুনতে শুনতে ক্রোধে উত্তেজনায় দেলোয়ারের শরীর কেঁপে উঠলো —হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো সে। পার্শ্বচর ও অন্যান্য উজীররা তাকে নিয়ে এল নবাবগঞ্জের মহলে।

গুপ্তচর অত্যন্ত গোপনে খবর আনলো—ইকবালের চিরশত্রু আলী ইউসুফ শাহানসা আলীমর্দ্দানকে খুশী করার জন্য কিছু খুপ-সুরৎ জেনানা ধরে নিয়ে গিয়েছে, সম্ভবতঃ সে পেয়াসবাড়ীর কর্তৃত্ব চায়। খবর শুনে গর্জ্জন করে উঠলেন দেলোয়ার হোসেন।

—ঝুটা বাৎ, বিলকুল ঝুটা।

—কসুর মাফ কিজিয়ে হুজুর, বান্দা বিলকুল সচ্চা বোল রহা হ্যায়।

অসুস্থ শরীরেই দ্রুতগতিতে দেলোয়ার ছুটলো পেয়াসবাড়ীতে মালিক ইকবালের সাথে দেখা করতে।

দেলোয়ার অসুস্থ এ খবর আমীর উজীরদের কানে পৌঁছতেই হাসির তুফান উঠলো ওদের মধ্যে। আরে দুনিয়ায় কি জেনানার কমতি আছে! হিম্মৎ থাকে তো রোজানা এক-একঠো লে আও, তা না করে নাদান বাচ্চার মত একটা জেনানার জন্য ভবিষ্যৎকে খারাপ করছে—ছিঃ ছিঃ।

উৎকণ্ঠিত ইকবাল অসীম ধৈর্য্যের সাথে দেলোয়ারের সমস্ত খবর শুনলেন। তারপর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললেন—দুঃখ কোরোনা দেলোয়ার, তোমার এই চরম বিপদের জন্য আমিই দায়ী। আমিই তোমাকে নবাবগঞ্জের আসনে বসিয়েছিলাম। নসীব যে এমন করে বেইমানী করবে কে জানে!

—না জনাব, আপনি দায়ী নন, আপনি তো আমাকে সৌভাগ্যের দিকেই ঠেলে দিয়েছিলেন। আমারই তা সইলো না। আমার কথা থাক জাঁহাপনা, কিন্তু আপনার সম্পর্কে কি সব শুনছি!

—সবই ঠিক শুনেছ দেলোয়ার। শাহানশা আলীমর্দ্দানের ওমর যত বাড়ছে ততই সে বুদ্ধিভ্রষ্ট হচ্ছে। আমাকে এখান থেকে না সরালে তার নাকি সুবিধে হচ্ছে না, তাই এবার বেছে নিয়েছেন

আলী ইউসুফকে। আমার বিশ্বাস—সেই এ দুর্ঘটনার নায়ক—এ সমস্তই তার কাজ।

—তবে কি সোজা নবাব আলীমর্দ্দানের কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইবো—গর্জ্জে উঠলো অসহিষ্ণু দেলোয়ার হোসেন।

—না, তা ঠিক হবে না। আলী গওহরের অবস্থা তো জান, কিছু বলতে গিয়ে জান নিয়ে ফিরতে পারেনি সে।

—আমি আলী গওহর নই জাঁহাপনা। দশটা শির না দিয়ে আমার শিরতো নাবানো যাবে না!

—অধৈর্য হয়োনা দেলোয়ার। রাজনীতিতে বল প্রয়োগের চেয়ে বুদ্ধি আর বিচক্ষণতাই অনেক বেশী কার্যকরী। আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করবো—কিই বা সান্ত্বনা দেবো! শুধু এটুকু বলতে পারি—কিছু দিন অপেক্ষা কর, যদি প্রতিকার করতে না পারি তবে দু'জনেই এক সাথে এ দেশ থেকে চলে যাবো। কথা বলতে গলার স্বর ভারি হয়ে উঠলো মালিক ইকবালের। তা দেখে হতভম্ব দেলোয়ার বললো—আমি আর এ মুখ নিয়ে আমার এলাকায় ফিরে যাবো না নবাব সাহেব, আমার আর কোন কিছুর দরকার নেই। চোখের সামনে জেনানারা বেইজ্জত হবে, প্রজারা অত্যাচারিত হবে, দুখের তুফান ছুটবে তামাম মুল্লুকে, তাও যদি কিছু না করতে পারি তবে মাফি করুন জাঁহাপনা অমন কর্তৃত্বে আমার দরকার নেই।

বেদনায় জর্জ্জরিত দেলোয়ারের কাঁধে হাত রেখে মালিক ইকবাল বললেন—দেলোয়ার তোমাকে তো বলেছি আর অল্পদিনের প্রতীক্ষা। তারপরেই তোমার মুক্তি। আমি জানি, তুমি যে দুঃখ পেয়েছ তা বলে বোঝানো যায় না, তাই এর বদলা না নিয়ে সহজেই চলে যাবে? বদলা অবশ্যই চাই দেলোয়ার, তা-না হোলে বৃথাই এই নবাবী আর ঝুটা এই মরদানা! শুধু কিছু সময়ের প্রয়োজন দেলোয়ার—শুধু একটু সময়।

বিষণ্ন দেলোয়ার ফিরে এলো নবাবগঞ্জে। সর্বক্ষণ নিজের ঘরে বন্দী জীবন। কারো সাথে সহজে দেখা করেন না, কথা বলেন না, সব সময় কেমন অবসন্ন ক্লান্ত মানুষ। সময়মত খাওয়া-দাওয়া করেন না। খেদমৎকারেরা কোন দিন যার কাছে উচ্চ গ্রামে কথা শোনেনি, রাগ করেনি তারাও হতবাক। খিট্‌খিটে স্বভাব হয়েছে আজকাল। অতি সাধারণ ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যখন-তখন। হাসতে তো ভুলেই গেছেন বহুকাল আগে। হাকিম বদ্যির ঔষধও আজকাল নিয়মিত খান্ না। খিদমৎকারদের বলেন—দাওয়াই খেয়ে বেঁচে কি লাভ! ওতে তো শরীরের ব্যাধি সারে, কিন্তু মনের ব্যাধিতো যাবে না।

দেলোয়ার হোসেনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে শত্রুপক্ষ সজাগ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। শুরু হয়েছে প্রজাদের ওপর অত্যাচার আর জুলুম। মনহলী. নিমাসরাই, ছোটপাণ্ডুয়া, প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ নূতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আবার সেই পুরাতন সুর—কর দেয়া বিলকুল বন্দ্। অনুগত কর্ম্মচারীরা দেলোয়ার হোসেনের কাছে কথাটা তুলেছে, গুপ্তচরেরা এই বিদ্রোহের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু দেলোয়ার হোসেন সম্পূর্ণ নিস্পৃহ উদাসীন।

দেশের সমাজজীবন যখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, অত্যাচার যখন চরমে, সাধারণ প্রজারা চরম বিপদাপন্ন. তেমনি সময় হঠাৎ নবাব-গঞ্জের মহলে গাজী সাহেব এসে হাজির। অনেকক্ষণ দেলোয়ারের সাথে কথা-বার্তা বলার পর একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—হোসেন সাহেব, তামাম মুলুকের লোক আপনার দুঃখে কাঁদছে আর আপনি নিজে এই চার দেয়ালের মাঝে নিজেকে এমন করে আড়াল করে রেখেছেন কেন? এতে কি রাজ্যশাসন হয়? বাইরে বেরিয়ে

আসুন, দেখুন আপনার প্রজারা আপনার ব্যথায় কত অধীর। তারা মরীয়া হয়ে দুশমনের সাথে পাঞ্জা লড়তে চায়। আপনি জড় পদার্থের মত থাকলে কি বদলা নেয়া যায়!—কি হবে রাজ্যশাসন করে? যদি না অন্যায় অসত্যের বিচার হয়! আজ আপনার ঘরের বিবি গিয়েছে কাল সাধারণ মানুষের বিবি লোপাট হয়ে যাবে, অথচ এর কোন প্রতিকার হবে না। আপনার কি ইচ্ছে করে না এই জুলুমের বদলা নিতে! ইচ্ছে করে না সেই বেইমান তুর্কী নবাবের টুটিটা ছিঁড়ে ফেলতে? চোখ দুটো উপড়ে নিতে? যদি তা না পারেন, তবে বৃথাই আপনার ক্ষমতার আসনে বসা। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গাজী সাহেব। তিনি বুঝলেন দেলোয়ারও ক্রমশঃ ক্রোধে, ঘৃণায় উত্তেজিত হচ্ছে, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে। তিনি বল্লেন—মনে রাখবেন হোসেন সাহেব, আপনি একদিন ওয়াদা করেছিলেন, দেশের নারী সমাজের ইজ্জত রক্ষা করতে না পারলে এই আসন ছুড়ে ফেলে আপনি আমাদের সব্বার সাথে মিলেমিশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন। ইয়াদ আছে সে কথা?

—ইয়াদ আছে গাজী সাহেব, সব ইয়াদ আছে।

—তবে আর দেরী কেন? আসুন আমার সাথে। আপনার প্রজাদের সাথে এক হয়ে চলুন এই জুলুমবাজী খতম করি। দেশের মানুষরা আপনার জন্য জান কুরবানী করতে পর্যন্ত ডর করে না। শুধু চাই আপনার নেতৃত্ব। আপনি এগিয়ে আসুন, দেখবেন অত্যাচারী নবাবকে গদী থেকে নামিয়ে দলে পিষে চুরমার করে দিয়ে আমরা আপনাকে গদীতে বসাবো। একটা জানের বদলে দশটা জান নিতে পারলে তবেই হয় বদলা বুঝলেন হোসেন সাহেব!

কথা শুনতে শুনতে কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো দেলোয়ার। উত্তেজিত কণ্ঠে বললো—আর কিছু বলবেন না গাজী সাহেব—কিছু বলবেন না। শোকে বিহ্বল হয়ে মনে হয়েছিল আমি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছি, ফুরিয়ে গেছি একদম। ঠিক আছে, আপনারা যখন আছেন তখন আমার আর ভাবনা কি। আমিও আপনাদের সাথে

সব সময় সর্ব্বপ্রকারে রইলাম। চলুন হুসামুদ্দিন সাহেবের সাথে মোলাকাৎ করে আসি। আজকে, এখনই।

নবাব হুসামুদ্দিন পরম পরিতোষের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন দেলোয়ারকে। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা শেষে ইকবাল হোসেনও যোগ দেবেন তাদের সাথে; এ খবর শুনে খুশী হয়ে উঠলেন নবাব সাহেব, বল্লেন—আমিই তাহলে একদিন দাওয়াৎ করি কি বলেন গাজী সাহেব।

—না, সে আপনি ভাববেন না। আপাততঃ হোসেন সাহেব মালিক ইকবাল হোসেনকে নিয়ে একদিন এখানে আসুন। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বেশ, আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন।

দেলোয়ার হোসেনকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন গাজী সাহেব অত্যন্ত সন্তর্পণে। ওরা বেরিয়ে যেতেই আবার নবাব হুসামুদ্দিন খুশীয়ালী মেজাজে কল্পনার সাগরে ডুব দিলেন। রাজ্য তার চাই, চাই মসনদ-মালিকানা।

যন্ত্রণার আগুনে দীর্ঘ সময় জ্বলছেন তিনি। অসহ্য এ যন্ত্রণা। সুদূর বিদেশী এসে এ দেশের মসনদ দখল করছে, হুকুম তামিল করছে, একথা মনে হতেই ভেতরটা যেন ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো। দেলোয়ার, ইকবাল এদের পেলে যদি বদলাটা নেওয়া যায় তবেই হয়ত মনের আগুনটা নেভে। তা না হোলে সারাজীবন এই অন্ধকার আর যন্ত্রণা। এর চেয়ে কি মৃত্যু ভাল নয়? অব্যক্ত ব্যথায় ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন নবাব সাহেব।

মালিক ইকবালের ডাক পড়েছে শাহানশার দরবারে। হাজারো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। প্রজারা কর দিচ্ছে না। নবাবের

লোকদের বেইজ্জত করছে। গোপনে গোপনে দুশমনরা সংগঠিত হচ্ছে। নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রবল হয়ে উঠছে, অথচ মালিক ইকবাল এ সব অন্যায়ের কোন প্রতিকার তো করছেনই না, বরংচ কাফের ও বিদ্রোহীদের গোপনে উস্কানী দিচ্ছেন এবং নিজেই শাহানশা হবার খোয়াব দেখছেন।

অভিযোগের প্রত্যুত্তরে মালিক ইকবাল কিছু বলার চেষ্টা করতেই গর্জ্জে উঠলেন শাহানশা আলীমর্দ্দান। সমস্ত অনুচর উজীর আমীররাও এক সাথে রক্ত চক্ষু করে তাকাল ইকবালের দিকে। সিপাহী সর্দ্দারও কোষবদ্ধ তরবারীকে ঝাঁকিয়ে নিল একবার। যেন সব্বাই প্রস্তুত, শুধু শাহানশার হুকুমের প্রতীক্ষা। মালিক ইকবালের মনে হোল সে বধ্য ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। শাহানশা রক্ত চক্ষু বিস্তারিত করে বললেন—কমবখ্‌ত, এক-জবান নেহি, নিকালো। এক পয়সে কি হিম্মৎ নেহি লাখ রূপেয়া কি বাৎ।

ইকবালের ইচ্ছে হোল মুহূর্ত্তে আলীমর্দ্দানের মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নেয়, জিভটা টেনে বাইরে নিয়ে আসে। কিন্তু এতো শুধু ইচ্ছাই, পথ কোথায়! আলী গওহরের অবস্থাটা মনে হোল তার। তা না হলে নাকের ডগায় তার দেওয়া পাঞ্জাটা ছুঁড়ে দিলেই জবাবের মত জবাব দেওয়া হোত। শাহানশা বলে চললেন—ইকবাল, শুধু মাত্র দুটো কান আর দুটো চোখ নিয়ে আমি এখানে আসিনি। আমার লাখো লাখো কান আর চোখ তামাম মুল্লুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—খুব হুঁশিয়ার। তোমার দুঃসাহস আমাকে অবাক করেছে ইকবাল। আমারি পয়জার মাথায় করে তুমি পেয়াস-বাড়ী নবাবগঞ্জের দেখাশোনা করছ। আর এখন আমারি বিরুদ্ধে দুশমনের সাথে মুলাকাৎ করে সলাপরামর্শ করছ বেইমান। জানো, আমি তোমাকে কুত্তা দিয়ে খাইয়ে দিতে পারি!

নবাব সাহেব মুখ ফিরিয়ে বললেন—জানো ওয়াজীর, ইকবাল লক্ষৌতির নবাবীয়ানার খোয়াব দেখছে! বাচ্চা নাদান। খোরাসান পারস্যের খবর ওর জানা নেই, তাই আগুনের সাথে দিল্লাগী করছে।

কথা বলতে বলতে সহসা প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠলেন শাহানশা আলীমর্দ্দান—নিকালো বেতমিজ, এক হপ্তেকা অন্দরমে তুম আপনা জান লেকর হমারে মুল্লুক সে নিকাল যাও, নেহিতো তুনিয়াকা খেল্ খতম কর দেঙ্গে।

মাথা নীচু করে অসহ্য যন্ত্রণায় বাইরে বেরিয়ে এলো ইকবাল, সাথে নবাবের লোকজন আর পেয়াসবাড়ী-নবাবগঞ্জের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্য বৃদ্ধ ওয়াজির ও অঘটনের নায়ক আলী ইউসুফ।

পেয়াসবাড়ী থেকে খবর এসে পৌঁছল নবাবগঞ্জে। দেলোয়ার হোসেন তখন গাজী সাহেবের আস্তানায়। তাকেও ছুটে আসতে হোল নবাবগঞ্জে, সাথে গাজী সাহেব। আলীমর্দ্দানের সমস্ত আচরণের কথা বলতে বলতে শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠলেন মালিক ইকবাল। জীবনে এত বড় অপমান কল্পনাও করেন নি তিনি।

গাজী সাহেব এই মওকার অপেক্ষায় ছিলেন, প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আরো তাতিয়ে তুললেন তাকে।

নবাব হুসামুদ্দিন, গাজীসাহেব, বিশ্বরূপ, দেলোয়ার আর ইকবালের একত্র সমাবেশ পাণ্ডুয়ার মহলে। ইকবালই কথাটা তুললেন—নবাবী খতম করে দিয়ে এলাম নবাব সাহেব, এখন আমরা সব্বাই আপনার পাশে। বলুন কি করা আমাদের কর্ত্তব্য? দেলোয়ার মুখ চাওয়া-চাওয়ী করলো মালিক ইকবালের সাথে। হুসামুদ্দিন বললেন—এ ব্যাপারে গাজী সাহেব যা বলবেন তাই হবে।

—হবে আবার কি! এই তুশমনের মুকাবিলা করতে হবে। তুর্কীর বাচ্চা বাংলা দেশে বসে চোখ রাঙ্গাবে, যাকে যা ইচ্ছে বলবে, তাতো হতে পারে না। এই কসবীর বাচ্চাকে খতম না করা পর্যন্ত আমাদের চোখের ঘুম, মুখের হাসি, পেটের ভাত কিছুই ভাল লাগবে না ইকবাল সাহেব।

বৃদ্ধ গাজী সাহেব উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন।

—আমারও সেই কথা—ক্রোধে টগবগ করে ফুটে উঠলো বিশ্বরূপ।

—আলীমর্দ্দান আমার যে সর্ব্বনাশ করেছে তাতে তার জান নিলেও উপযুক্ত বদলা নেয়া হয় না। আমার ইচ্ছে ওকে বেঁধে তামাম মুল্লুকের মানুষগুলোর কাছে ওর অত্যাচারের শাস্তির স্বরূপটা দেখিয়ে দি। গজরাতে লাগলো দেলোয়ার। গাজী সাহেব সবার কথা শুনে বললেন—তাতো হোলো, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ?

—কেন আমি, উত্তর করলো বিশ্বরূপ। আশ্বস্ত হলেন গাজী সাহেব। গভীর রাত পর্যন্ত সলা-পরামর্শ হবার পর ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সবাই বেরিয়ে এলেন গাজী সাহেবের সাথে।

সারা রাত ঘুম আসে না মালিক ইকবালের। গাজী সাহেবের আস্তানায় নিরাপদ থাকলেও সেদিনের অপমানের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তিনি। অসহ্য ! অসহ্য এই অসম্মান।

তামাম রাত দূর আকাশের নিবু নিবু তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন তিনি।

নবাব শাহানশা আলীমর্দ্দান স্বয়ং এসেছেন পেয়াসবাড়ীতে। নয়া আমীর আলী ইউসুফকে দেখা-শোনার ভার দিয়ে বেতমিজ প্রজাদের একটু শাসন করে যাবেন এই তার বাসনা। তামাম মুল্লুকে এত্তেলা চলে গেল। কিন্তু দু'দশজন আমীর ছাড়া আর কোন প্রজারাই এলো না শাহানশার সাথে মুলাকাৎ করতে।

তাজ্জব কি বাৎ! অবাক হোল সবাই।

নয়া আমীর সাহেব তড়িঘড়ি শাহানশার ইজ্জত বাঁচাবার ফিকির করে খুব ধুমধামের সাথে শিকারে যাবার প্রস্তাব করে ফেললেন।

পেয়াসবাড়ী থেকে চল্লিশ মাইল দূরের পথ। ঘন জঙ্গলে ঘেরা হাতিমারির গভীর অরণ্য। সূর্য্যের আলোকেও এখানে ঢুকতে

অনেক কসরৎ করতে হয়। বনানীর সবুজ পাতায় আকাশের নীল এখানে প্রায় অদৃশ্য। মাঝে মাঝে শুধু পা-চলা পথ। এখানে শিকারে যাওয়া অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

শাহানশা জিন পরানো মস্ত বড় ঘোড়ায় চেপে চলেছেন সংকীর্ণ পথ ধরে ধরে। আগে আগে স্থানীয় পাহাড়ী আদিবাসী সর্দার, পেছনে পেয়াসবাড়ীর নয়া আমীর আলি ইউসুফ।

বাঈজীর দলও চলেছে সাথে সাথে। রাত কাটাতে হলে যেন নিরামিশ,না থাকতে হয়। তার জন্য নাচ-গান মৌজ করার উপকরণও প্রস্তুত। খুব বেশী লোক-জন থাকলে শিকারে বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা, তাই যথাসম্ভব কম লোক নিয়েই এই শিকার-বিহার।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, পাখীদের ঘরে ফেরার তাড়া আর মাঝে মাঝে নিবিড় ঘন সবুজ ঝাড়-ঝোপের মধ্যে ডানা ঝাপটানোর শব্দে চম্‌কে চম্‌কে উঠছেন শাহানশা।

প্রকৃতির অদ্ভুত বেসাতি এখানে।

সারা জীবন সিংহাসন মণিমুক্তা নারী সুরায় আসক্ত প্রাণও এখানে এলে কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়। খুব ভাল লাগে এই শান্ত সবুজ পরিবেশ।

হুজুরের ভাল লাগার সাথে সাথে তাঁবুর ব্যবস্থা হোল এখানে। ঝোপ-ঝাড় কেটে রাত কাটাবার প্রস্তুতি চললো দ্রুত গতিতে।

রাত বাড়ছে। গহন অরণ্যে ঘেরা জায়গাটা চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। ঝিকমিক করে দু'একটি তারা উঁকি-ঝুঁকি দেবে, এ সুযোগও নেই।

একটু দূরে বাবুর্চির দল আহারের ব্যবস্থায় ব্যস্ত, এদিকে গান-বাজনার তদারকীতে ব্যস্ত নয়া আমীর আলী ইউসুফ।

শাহানশার তাঁবুতে গান ধরেছে বাঈজী।

গোলাবী নেশায় মজবুর শাহানশার চোখ, সামনে বসা বসরাই

গুলাবের দিকে দেখে কেমন করে উঠলো তার মেজাজ। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আগুন জ্বেলে যেন ডাক দিচ্ছে তাঁকে। দেহ কাঁদছে, যৌবন কাঁদছে, নিষ্পেষিত হতে চাইছে।

বাঈজীর কণ্ঠে সুরের মূর্চ্ছনা।

এই গভীর অরণ্যে মানুষের আনন্দধ্বনি এই প্রথম। গানের শব্দে সচকিত হয়ে উঠেছে কীট-পতঙ্গরা, হতবাক পাখীরা। সব্বাই যেন নূতন স্বাদের শব্দে নিশ্চুপ। বন্ধ হয়েছে প্রকৃতির কলগুঞ্জন, রাত্রির নিস্তব্ধ সংগীত এখন নিবিড়।

পাশে একটু দূরে অন্য ছাউনী।

সিপাহীরা এখানে আনন্দ হৈহুল্লোড়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে কোরাস সংগীতের সুর ভেসে আসছে। আর এদিকে তাঁবুতে নবাব আলীমর্দ্দান তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সম্মুখে বসে থাকা বাঈজীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এ মুখ যেন খুব পরিচিত তার, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারছেন না—কোথায় দেখেছেন এঁকে। জীবনে অনেক বাঈজী দেখেছেন তিনি, কিন্তু এ যেন আর অন্য বাঈজীদের চেয়ে স্বতন্ত্র। টিকোলো নাক,মৃগ নয়ন চোখ, দেহের ত্রিভঙ্গে রূপের যাদু বিচ্ছুরিত। কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছে সুরের অমৃতধারা। তবু যেন এই মিষ্টি মুখের পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার গাম্ভীর্য্য লুক্কায়িত। বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে খেলিয়ে খেলিয়ে গ্রাস করে, শাহানশাও তেমনি বাঈজীর রূপসুধা পান করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ কেটেছে। নবাব উঠে দাঁড়িয়েছেন। না, আর গান নয়, পূর্ণ পরিতৃপ্তি চাই। দু'চোখে কামনার আগুন জ্বলে উঠেছে তার। হঠাৎ নবাবকে হতচকিত করে একজন সিপাহী তাঁবুতে ঢুকতেই চমকে উঠলেন শাহানশা, মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করেই বজ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কৌন! ক্যায়া মাংতা?

—চোপ্, একটা কথা বলেছ কি জান খতম করে দেবো বেল্লিক! গর্জে উঠলো সিপাহী। কথা শেষ হতে না হতে আরও দু' তিনজন

সিপাহী ঢুকে পড়লো এক সাথে। শাহানশা আড়ষ্ঠ হয়ে গেলেন। তারই সিপাহীরা তারই সম্মুখে গর্জন করবে,অস্ত্রধারণ করবে, একথা স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি। পাশের তাঁবুতে পেয়াসবাড়ীর নয়া আমীর আলী ইউসুফ। ইচ্ছে হোল চীৎকার করে ওঠেন, কিন্তু সিপাহীদের শানিত তলোয়ারের দিকে তাকিয়ে সাহস পেলেন না তিনি। বাঈজী হঠাৎ কলকণ্ঠে বলে উঠলো—সেলাম, বহুত সেলাম নবাব শাহানশা দীন দুনিয়ার মালিক নবাব আলীমর্দ্দান সাহেব, বহুত সে···লা···ম। দেখুন তো খোদাবন্দ চিনতে পারেন আমাকে ? কথা বলতে বলতে বাঈজী খুলে ফেলেছে তার চুমকী বসানো ঘাঘরা, রংদার আব্রু-ওড়না, ছিঁড়ে ফেলেছে শাহানশার দেয়া বহু মূল্য হীরা-জহরতের মালা। শ্বেতশুভ্র পোশাক পরিহিতা এক কিশোরী নূতন করে যেন উপস্থিত হয়েছে তার সম্মুখে।

নারী বললো—পিশাচ, আমি হচ্ছি পণ্ডিত শিরোমণির কন্যা দেবযানী, যাকে অপহরণ করে ভোগের বস্তু হিসেবে পেতে চেয়েছিলে, কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে সুযোগ তোমার হয়নি। তুমি জেনেছিলে সে পলাতকা কিন্তু আমি পালাইনি। দীর্ঘকাল তোমার রক্ত তৃষ্ণায় এখানে অপেক্ষা করেছি। আজ—আজ সেইদিন এসেছে, দ্যাখ ভাল করে চেয়ে দ্যাখ। তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই সিপাহীদের জানো, এরা কারা ? চমকে উঠলেন শাহানশা।

নারী বললো—এই হচ্ছে পণ্ডিত রঘুমণির পুত্র বিশ্বরূপ। দীর্ঘকাল যে বনে জঙ্গলে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছে। আর তার পাশে তোমার পরম বিশ্বাসী অনুগত আমীর মালিক ইকবাল, যাকে চরম অপমান করে লক্ষৌতি থেকে তাড়িয়েছিলে কুকুর বেড়ালের মত, আর এই হচ্ছে হতভাগ্য আমীর দেলোয়ার হোসেন, যার বিবিকে লুণ্ঠন করিয়েছ তোমার পেয়ারের আলী ইউসুফকে দিয়ে। আজ তোমার বিচার নবাব সাহেব, আজ তোমার কঠোর বিচার—হাঁপাতে লাগলো কিশোরী।

কি যেন বলতে চাইলেন শাহানশা, কিন্তু প্রচণ্ড ধমকে থামিয়ে

দিল বিশ্বরূপ। আর সাথে সাথে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা শানিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র আমূল বিঁধিয়ে দিল মালিক ইকবাল—শাহানশার বুকে। আকাশ ফাটানো জোরে হো-হো করে হেসে উঠলো দেলোয়ার হোসেন, প্রাণখোলা এমন হাসি বহুদিন হাসেনি সে।

দেবযানীর হাত ধরে ঝড়ের মত বাইরে এলো বিশ্বরূপ। তার পিছু পিছু মালিক ইকবাল আর দেলোয়ার। বিদ্যুৎ গতিতে তিনটি অশ্ব ছুটে আসছে। একজন অশ্বারোহীর হাতের তীক্ষ্ণ বল্লমে গাঁথা পেয়াসবাড়ীর নব নিযুক্ত আমীর আলী ইউসুফের ছিন্ন মুণ্ড—ওটা সে দেলোয়ার হোসেনকে ভেট দিতে চায়।

নবাব শাহানশা আলীমর্দানের মৌতের খবরটা তামাম মুল্লুকে ছড়িয়ে পড়তেই পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো প্রজারা। গুরুভার নামলো বুক থেকে। অনেকে বললো, এটা দুশমনের কাজ। বড় বড় ফকিররা অনেক ভেবে চিন্তে বললেন—ব্যাপারটা যখন গভীর জঙ্গলে তখন জীন্ পরীদেরই কাজ এটা। বিভিন্ন কল্পনার জাল বুনতে বুনতে প্রায় তিনদিন পর নবাব আলীমর্দ্দানের দু'একজন সাথী সিপাহী এসে ঘটনার বর্ণনা দিতেই সন্দেহের নিরসন হোল। দুশমনই বটে, তা-না হোলে কি সেই গভীর জঙ্গলে গিয়ে এ-কাণ্ড কেউ করে!

লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা কে হবে এ নিয়ে তুমুল আলোড়ন চললো ওমরাহ মহলে। খোয়াবও দেখতে লাগলেন অনেকে। তবে ব্যাপারটা ভাবা যত সহজ, কার্যতঃ তা অত্যন্ত কঠিন। এটা মালুম করে অনেকেই পাঁয়তাড়া ভাঁজতে লাগলেন। দিল্লীর নবাব শাহানশার হুকুমনামা এনে তামাম গৌড় রাজ্যের খবরদারী করাতো আর চাট্টিখানি কথা নয়।

তামাম ওমরাহ একত্রিত হয়ে সলা-পরামর্শে বসলেন। মিলে জুলে এখানকার দায়িত্ব কারো ওপর দেয়া যায় কিনা, এ

ব্যাপারে দিল্লীতে গিয়ে দরবার করার ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করা যায় কিনা; কিন্তু এসব সলা-পরামর্শকে মুহূর্তে উড়িয়ে দিয়ে মিলকী মহদীপুরের ওমরাহ বল্লেন—আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে! নিজেদের লোক না বসিয়ে আপনাদের কথায় ওরা কাজ করবে? তাছাড়া ওদের কাছে গৌড় হচ্ছে স্বর্ণখনি। তাবৎ টাকা পয়সা, ফল-ফসলের আসল জায়গা। সুতরাং ওসব অবাস্তব আলোচনা ছেড়ে চলুন বরংচ পুরানা শাহানশা হুসামুদ্দিন সাহেবের কাছে যাওয়া যাক। অনেক দিনতো তার খবরই জানিনা, দেখা যাক জিন্দা আছে কিনা! আর নিজে এ ব্যাপারে কিছু করছেন কিনা।

কথাটা অনেকের মনে ধরলো বটে, কিন্তু হুসামুদ্দিনের সাথে দেখা করতে যাওয়ার বিপদও অনেক, কারণ যিনি এখানকার শাহানশা হবেন, তিনি যদি এসে জানতে পারেন যে হুসামুদ্দিন সাহেবকে নিয়েও অনেক ঘোঁট পাকানো হয়েছে, তাহলে হয়তো আরেক ফ্যাকড়া। তার চেয়ে বাপু চোখ আছে ছাখো, কান আছে শোন, মুখের রা'টি বের করো না। আমরা তো হুজুরে হাজির, তা যে কেউই শাহানশা হোক না কেন।

নবাব শাহানশা হুসামুদ্দিন সাহেবের ভাগ্য আবার জ্বলে উঠলো উজ্জ্বল দীপ্তিতে। তুর্কী শাসন খতম হতেই নবাব সাহেব ফের ক্ষমতার আসনে বসলেন। সারা দেশ জুড়ে খুশীয়ালীর ঢেউ উঠলো। তামাম মুল্লুকে নবাব সাহেবের অভিষেকের প্রস্তুতি হোল। সমবেত প্রচেষ্টায় তুর্কী শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে গৌড় দেশের মানুষ, খুশীতে মজবুর প্রজাবৃন্দ।

বৃদ্ধ গাজী সাহেব নিয়েছেন ওয়াজীরের দায়িত্ব। সেনাপতির দায়-দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বিশ্বরূপকে। কিন্তু যুক্ত করে সবিনয়ে আপত্তি জানিয়েছে সে, বলেছে—শাহানশা, আমি দীন ব্রাহ্মণের সন্তান। সেনাপতিত্বে আমার লোভ নেই। নিয়মনীতির শৃঙ্খলে

বাঁধা জীবন যাপনে আমি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, আমাকে মার্জনা করুন নবাব সাহেব—ও দায়িত্ব নিতে আমি অক্ষম। বৃদ্ধ গাজী সাহেব হাত দুটি ধরে অনুরোধ করেছে, বলেছে—তোমার ওপর আমাদের অনেক ভরসা বিশ্বরূপ। আজকে এই আনন্দ উৎসবের পেছনে তোমার যে অবদান—তা আর কেউ না জানলেও আমরা তা জানি। তুমি যদি এর দায়িত্ব না নিতে চাও, তবে আমাদের সমস্ত দেশবাসীর প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ তুমি আমাদের আশা ভরসা। তুমি সেনাপতির দায়িত্ব নিলে দেশবাসী নিরাপদ বোধ করবে, শান্তিতে বসবাস করবে, তুমি আর আপত্তি করো না বিশ্বরূপ।

—না গাজী সাহেব, কোন পদমর্য্যাদাই আমাকে এখানে আট্‌কে রাখতে পারবে না। এ রাজ্যে আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ বিচক্ষণ বলশালী যোদ্ধা আছেন, তাদের কাউকে এ গুরুদায়িত্ব দিন, তাহলেই হবে। জীবনে যদি কোন সময় চরম দিন আসে, তবে সেদিন নিশ্চয়ই আপনাদের পাশে দাঁড়াবো, সাধ্যানুযায়ী আপনাদের সেবা করবো। জীবনের অনেকগুলো দিনতো বনে জঙ্গলে কাটালাম, এবার ভাই-বোন দু'জনে অনেক দূরে শান্তির লোকালয়ে গিয়ে বাস করতে চাই। আপনি আর বাধা দেবেন না গাজী সাহেব। কথায় মিনতি ঝরে পড়ল বিশ্বরূপের। ছলছল করে উঠলো গাজী সাহেবের চোখ, নবাবসাহেবও বেদনার্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সবার কথাকে অগ্রাহ্য করে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলো বিশ্বরূপ, গৌড়ের নবাব প্রাসাদ থেকে।

প্রাসাদের বাইরে তখন অসংখ্য মানুষের ভিড়। পুরনো নবাব সাহেবকে সেলাম জানাবার অপেক্ষায় আকুল হয়েছে প্রজাবৃন্দ। তামাম এলাকাকে সাজানো হয়েছে রং-বেরংয়ের ফুলে ফুলে। অসংখ্য ভিড়ের মাঝে মুহূর্ত্তে মিশে গেল বিশ্বরূপ। চারদিকে এত আনন্দ উৎসবের মাঝ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে গিয়ে মনটা কেমন বাধা দিতে চাইছিল তার, কিন্তু মুহূর্ত্তে দুর্ব্বলতাকে জয় করে জোর কদমে এগিয়ে গেল সে। এই অসংখ্য মানুষ, অগণিত

প্রজারা হয়তো কেউ তাকে জানলো না, কিন্তু নবাব সাহেব—গাজী সাহেব, এরা তো জানেন, আজকের এই খুশীয়ালীর রোশনাই ফোটানোর পেছনে তার দান কতখানি।

বিজয় মিছিল প্রস্তুত।

মিছিলে সামিল হয়েছে সমস্ত প্রজা। দূর দূরান্ত থেকে মোবারক জানিয়ে ছুটে এসেছে ওমরাহ, সর্দ্দার জায়গীরদারেরা। তাঞ্জাম অপেক্ষা করছে। অশ্বারোহী সৈন্যরা অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষারত।

নবাব সাহেব ধীর পায়ে দরবার মহল থেকে নেমে এসে প্রজাদের মাঝে দাঁড়ালেন। দু'চারজন বয়স্ক আমীর-ওমরাহ ঘিরে ধরলেন তাকে। গাজী সাহেবের সাথে মাঝে মাঝে সলাপরামর্শ করতে করতে আর প্রজাদের সাথে মোবারকবাদ জানাতে জানাতে এগিয়ে চল্লেন তিনি। বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন গাজী সাহেব, যদিও সবাই তার চেনা, তবু এই অল্প সময়ের ব্যবধানে কোন অখ্যাত অজানা যদি বিখ্যাত হয়ে থাকে তারই পরিচয় মাত্র।

মালিক ইকবাল হোসেন তাঁর পুরানো এলাকা পেয়াসবাড়ীর দায়িত্বেই আছেন, তবে আপাততঃ এই উৎসবের মেহমানদের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্বও তাঁর ওপর।

বহুৎ দিন শুকনো শুকনো কাটছিল জীবনটা। সরাবীর সাথে দেখা হয়নি বহুকাল। বেশ জমিয়ে একটা গানের মহফিলের ব্যবস্থা করে ফেললেন মালিক-ই-ইকবাল। নওজোয়ান ছোকরা ওমরাহ আর খান্দানীদেরই প্রবেশাধিকার এখানে। কথা শুনে হেসে বলেছিল গাজী সাহেব—তাহলে আজ গানের মহফিলে যাচ্ছি, কি বল ইকবাল!

—জী নেহি গাজী সাহেব। পাকাচুলের পথ সেখানে বিলকুল বন্ধ্। আর তাছাড়া বহু দিন পর এই সুহাগী রাতের দর্শন পাবো

একটু আমেজ করে তামাম তুনিয়াকে বিলকুল বেওকুফ বানিয়ে মৌজ করবো, তাতেও আপনি ঝামেলা করবেন গাজী সাহেব !

ইকবালের কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

ওপরের ঘরে গিয়ে আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল জিন্নাতি। আব্বাজানের তুখের দিন শেষ হোল, কিন্তু তার তুখের দিন বুঝি ঘনিয়ে এলো। আগের মতো আব্বাজান সব সময় তার কাছে বসে থাকবে না। সারা সাম্রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে তখন কি বেটি জিন্নাতির কথা মনে থাকবে ! না, থেকেছে কোন নবাবের। অতীত তার চোখে এসে ভিড় করলো।

কত তুঃখের দিনে সেইতো সান্ত্বনা দিয়েছে আব্বাজানকে, বলেছে জীবন হচ্ছে জুয়া আর মসনদ হচ্ছে দাবার ঘুঁটি। কখনো এসপার কখনো ওসপার। আব্বাজান হয়তো এখন অতীতকে স্মরণই করতে পারবেন না। আশমানের সুরুজ যার মুখ দেখতে পায় না, সেই নবাব তনয়া অভাবে দারিদ্র্যে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন। নবাব সাহেব বলতেন—জিন্নাতি আমার বেটি নয়, ও আমার বেটা—আমার বাদশা। সেই থেকে জিন্নাতিও বড় হয়েছে ছেলের মত করে। লজ্জা সঙ্কোচ ফেলে এসেছে বোরখার অন্তরালে। কিন্তু বাবা যদি আত্মমর্যাদা, লোকলজ্জার ভয়ে আবার তাকে সে জীবনে ফিরে যেতে বলে ! পর্দ্দানসীন হতে বলে, তবে ?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল : নবাব সাহেব আসছেন, জিন্নাতি তড়ি-ঘড়ি নামতেই জড়িয়ে ধরলেন নবাব সাহেব।

—কিরে বেটি, একা একা ওপরে কি করছিলিরে ?

নিরুত্তর জিন্নাতি। বাবার বুকে মুখ গুঁজে সহসা ফুঁপিয়ে উঠলো সে। নবাব সাহেব আদরে-সোহাগে তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বল্লেন—আমি বুঝিরে বেটি, তোর মার জন্য মনটা খারাপ করছে। তাই না ? থাক্ তার কথা আর ভাবিসনে, সে আমাদের কাছে থাকলে অনেক তুঃখ পেতো, তার চেয়ে বেহেস্তে গিয়ে সুখে থাক। তাতেই আমরা খুশী।

—আব্বাজান।

—কি রে বেটি কিছু বলবি ?

—আচ্ছা আব্বাজান, তুমি কি আগের মত আমাকে তোমার কাছে ডাকবে ? কাছে আসবে ?

—ও, এই সব ভেবে ভেবে বুঝি তোর মন খারাপ হচ্ছে। হ্যাঁরে বেটি, তুই ছাড়া আর কে আছে আমার বলতো ? আর আমি তো তোকে বন্ধ ঘরে বাস করতে শেখাইনি, তোর যা ইচ্ছে হয় তাই করবি। যে কোন দরকারে আমাকে ডেকে পাঠাবি। এ স্বাধীনতা তো তোর বরাবরের।

চিবুক স্পর্শ করে সোহাগভরে দু'চোখের আঁশু মুছিয়ে দিলেন নবাব সাহেব। বড় দুঃখী মেয়ে তার। অনেক দুঃখ সয়েছে এই কচি বয়েসে। যতই নবাবীর দায়িত্ব আসুক না কেন, তার এই প্রাণের প্রিয় একমাত্র বেটিকে কি ভোলা যায় !

বেশ কিছুদিন পর বেগমের কথা মনে পড়লো। জিন্নাতিটা হয়েছে ঠিক ওর মায়ের মতো। তেমনি নাক-মুখ-চোখ, চুলের গোছা। যৌবনে ঠিক এমনি লাগতো তাকে। সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চোখ বুঁজে অতীতের সেই মিষ্টিমধুর দিনগুলোর কথা ভাবতে চাইলেন তিনি। চমক ভাঙ্গলো জিন্নাতির ডাকে।

—যাও আব্বাজান, সব্বাই নীচে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। জলদি যাও।

নবাব সাহেব কোন কথা না বলে সস্নেহে বেটির মাথায় হাত বুলিয়ে নীচে নেমে এলেন।

সম্মুখেই গাজী সাহেব। বেশ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক কোণে। উৎকণ্ঠিত নবাব শুধালেন—কী ব্যাপার গাজী সাহেব, ক হয়েছে।

—কিছু না জাঁহাপনা, আপনি চলুন, পরে আপনাকে বলবো।

—তা হয় না গাজী সাহেব। আমাকে বলুন কি হয়েছে ?

দেলোয়ারকে তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ আজকের

দিনে ওকে না পেলে যে তামাম জৌলুস মাটি হয়ে যাবে শাহানশা।

—ভাল করে দেখেছেন? কোথাও কোন কাজে যায়নি তো?

—না, সে তো না বলে কোথাও যাবার মানুষ নয়।

—তবে?

—যাক্ আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। চারদিকে লোক লাগিয়েছি আরো সিপাহীদের পাঠাচ্ছি তল্লাশির জন্য। আপনি দেরী করবেন না নবাব সাহেব। জৌলুসের সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

—কিন্তু বিশ্বরূপ নেই, দেলোয়ারকেও পাওয়া যাচ্ছে না, আপনিও এখানে থাকবেন না বলছেন। তবে কিসের এ জৌলুস গাজী সাহেব, কি হয়, না গেলে? বেদনায় গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি। গাজী সাহেব বল্লেন—নবাবের জীবনে ভাবাবেগের স্থান নেই শাহানশা। ওদের কথা পরে ভাববেন, আপাততঃ এই অসংখ্য মানুষদের সংগদান করুন। আমি ও ইকবাল এখানকার তদারকীতে থাকবো। দেলোয়ারের খোঁজ করার ব্যাপারে যা করার আমিই করছি—আপনি যান।

দীর্ঘ মিছিল চলেছে তামাম গৌড়সাম্রাজ্যের এলাকা ঘুরে ঘুরে। অগণিত মানুষের আনন্দ কলধ্বনিতে নবাব শাহানশা হুসামুদ্দিনের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে জনপদ। অত্যাচার অবসানে আনন্দের প্লাবন বয়ে চলেছে যেন। নবাব হুসামুদ্দিন অবাক বিস্ময়ে প্রজাদের আনন্দ প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি যখন প্রথম ক্ষমতায় আসেন, তখনও এত হর্ষধ্বনি দেখেননি, ভাবতে ভাবতে পুলকিত হলেন তিনি, কিন্তু এটা বুঝতে পারলেন না যে, এই আনন্দ এই বিজয় উৎসব নবাব হুসামুদ্দিনের সিংহাসন লাভের জন্য না। এ আনন্দ অত্যাচারী নবাব আলীমর্দ্দানের রাজত্ব শেষ হওয়ার জন্য। নবাব হুসামুদ্দিন

অধীর আনন্দে এগিয়ে চললেন গৌড়বাসীদের সাথে সাথে। বিরাট মিছিলের তিনিই একমাত্র মহানায়ক।

ভাবতেও ভাল লাগছিল তাঁর। দীর্ঘ দিনের দুঃখের রাত্রি শেষে আজকের এই শুভলগ্ন। যত দেখছিলেন ততই অবাক হচ্ছিলেন শাহানশা। রাস্তার দু'ধারের গৃহগুলি সাজানো হয়েছে পত্রে পুষ্পে। দেবদারু পাতা আর কৃষ্ণ চূড়ার তোরণ স্বাগত জানাচ্ছে শাহানশাকে। শঙ্খধ্বনিতে মুখর হয়েছে রাজপথ। ফুলের ঝর্ণা ছড়িয়ে দিচ্ছে কুলবধূঁরা। সম্রাট অভিভূত হলেন হিন্দু প্রজাদের অভ্যর্থনা দেখে। মুহূর্ত্তে মনে মনে ভেবে নিলেন—এ দেশের সমস্ত মানুষকে তিনি সুশাসন উপহার দেবেন। ভালবাসায় ভরিয়ে তুলবেন প্রজাবৃন্দের হৃদয়। পুরানা বাদশাদের মত সমস্ত সংকীর্ণতা দূর করে জাতি-ধর্ম নির্ব্বিশেষে সেবা করে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত স্থায়ী আসন করে নেবেন তিনি। কল্পনার পাখায় ভর করে মিষ্টি আমেজের নেশায় এগিয়ে চলছেন তিনি। পরিক্রমা আরো অনেকক্ষণ ধরে চলবে, বাঁক নিচ্ছে মিছিল। অসংখ্য সিপাহীর দল ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে সম্মুখে।

মিছিল বেশ কিছু দূর এগোতেই মালিক ইকবাল ফিরে এসেছে দরবার এলাকায়। তামাম মেহমানদের আদর আপ্যায়নের বিরাট গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর। এলাকার বিভিন্ন ওমরাহ, সর্দ্দার, শরীফদের মনের খবর তিনি আগেই জেনেছিলেন। কোন্ জিনিসে কার পসন্দ, আর কোথায় কি পাওয়া যায়, সব ভেবে চিন্তেই ব্যবস্থা করেছেন তিনি, আর স্রেফ নিজের ইয়ার দোস্তদের জন্য এক কোণে একটা মহল বেছে রেখেছেন।

সম্ভবতঃ এ ঘরটায় অত্যাচারী সম্রাটের খামখেয়ালী কোন শিকারী দোস্ত বাস করতো। সারা ঘরে বিস্তর কাগজ-পত্রের পাহাড়, মনে হয় মহাফেজখানা। আরেক দিকে লাঠি-বল্লামের

বাণ্ডিল তীর ধনুকের ছড়াছড়ি। দেয়ালে অসংখ্য তলোয়ার ঝুলছে। যেখানে সেখানে সম্বর, হরিণ, বন-মহিষের মাথার প্রতিকৃতি।

মালিক ইকবাল মুহূর্ত্তে তাবৎ ঝুট ঝামেলা হটিয়ে মহলকে মেজাজী মহফিলের আসর বানিয়ে ফেললেন। ফুলে ফুলে আর কাঁচের ঝালরে ঝকমক করতে লাগলো ঘরের শোভা। সুরেলা-কণ্ঠী বাঈজীদের মনপসন্দ বাজনা এলো, আর জওয়ানীপসন্দ বাঈজীদের জন্য এলো মখমলের তাকিয়া, সরাবি, আরো কিছু।

সারা ঘরে নীলাভ আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

চারদিকে মখমলের বিছানায় তাকিয়া বিছিয়ে আয়েষ করে বসেছে ওমরাহবৃন্দ। সবার হাতে লাল গোলাপের গুচ্ছ। মালিক ইকবালই মধ্যমণি আজকের এই উৎসবের।

সরাবী নিয়ে ঘরে ঢুকলো কয়েক জন বাঈজী। ওমরাহদের দৃষ্টি হুমড়ী খেয়ে পড়লো, রূপসুধা গিলতে লাগলো ত্ব'চোখ ভরে। খানিক পরে উজ্জ্বল পদঝংকারে এগিয়ে এলো বাঈজী রোশেনারা। সারাদেহে যৌবনের ডাক। উথাল পাতাল করছে উদ্ধত যৌবন। চোখের চাহনিতে বিত্যুতের ঝলক। ইকবালের মনে হোল তামাম ত্বনিয়ার তাবৎ রূপ এসে জড় হয়েছে বাঈজীর দেহে। খুশীতে মজবুর হয়ে উঠলো ইকবাল।

বাঈজী গান ধরেছে সুরেলা কণ্ঠে। সব্বার ঢুলু ঢুলু চোখ। মাঝে মাঝে খুশীর আওয়াজ দিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন অতিথিরা। বাঈজীর চোখের তারায় কামনার আগুন জ্বলছে। সারা দেহে যৌবনের ফুলকীগুলো জ্বালা ধরাচ্ছে চোখে। গানে আর মন নেই ইকবালের। মন যেন আরো কিছু চায়—অন্য কিছু। নেশায় চুর হয়ে থাকলেও এটা তার খেয়াল ছিল যে এতগুলো খান্দানী ওমরাহদের সামনে বাঈজীর সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপ নিতান্তই অশোভন। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিলেন মালিক সাহেব, মাঝে মাঝে বন্ধ

চোখটা খোলার চেষ্টাও করছিলেন, কিন্তু পারলেন না। খানিক পরেই হাত-পা ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়লেন মখমলের বিছানায়।

ইয়ার-দোস্তরাও অনেকে ঢলে পড়লেন এধারে ওধারে। বাঈজী ধীর পায়ে বাইরে বেরুতেই চাচলের ওমরাহ বলে উঠলো—পেয়ারী, সবাই ঘুমিয়ে গেছে, কিন্তু আমি তো জেগে আছি। আমাকে গান না শুনিয়ে, দিল না ভরিয়ে কেন চলে যাবে পেয়ারী? উত্তরের অপেক্ষা না করে বাঈজীকে জড়িয়ে ধরতেই ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়লো আরেক জনের ওপর। খিল খিল করে হেসে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বাঈজী।

ব্যথায় ককিয়ে উঠলো নৌসাদজঙ্গ। আরেকবার ওঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পাশে শুয়ে থাকা ওমরাহকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগলো—

—পেয়ারী, তেরে লিয়ে মেরে দিল ইকরার হো গয়ে।

শুয়ে থাকা মানুষটা বিরক্তিতে খিঁচিয়ে উঠলো—আঃ জ্বালালে দেখ্ছি, কে বাপধন মাঝ রাত্তিরে ফৈজিয়ৎ করছ! নৌসাদজঙ্গ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাকে আদর করতে লাগলো।

লক্ষৌতির গৃহে গৃহে আজ আনন্দের জোয়ার নেমেছে। দীর্ঘ দিনের অত্যাচার, পীড়ন সহ্যের পর গৌড়বাসী এতদিন তুর্বিনীত আলীমর্দ্দানকে রাজসিংহাসন থেকে হঠাতে সক্ষম হয়নি, তার তুনিয়াদারীও খতম করেছে। শঠতা, প্রবঞ্চনা গৌড়বাসীকে কম দেখতে হয় নি। আর দেখতে হয়েছে বলেই এ বিদ্যেটা বেশ রপ্ত হয়ে গেছে প্রত্যেকের। পদ্ম পাতায় জল আর রাজসিংহাসন, তুয়েরই আয়ু বড় ক্ষণস্থায়ী। এই ভাসছে মুক্ত বিন্দুর মতো উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে, পরক্ষণে হয়তো বিস্মৃতির কোন অতলে তলিয়ে গেল।

পদচ্যুত সম্রাট হুসামুদ্দিন আবার আসছেন রঙ্গ মঞ্চে। এর জন্য সলাহ পরামর্শ কম চলেনি। সকলকে ধীরে ধীরে সামিল করতে

হয়েছে এক দাবীর নিচে। তবেই তো আলীমর্দ্দানের মজবুত সিংহাসনের পায়া টলে গেছে। সে সব দিনে ধীরে সুস্থে বসে একটু আয়েষ করবে সে সময়টুকুও দেলোয়ারের মেলেনি। এখানে যাও, সেখানে ছোটো। দিন রাত্রি কেবল কাজ আর কাজ। অথচ তার মনের ভেতরটা কেউ বুঝে দেখলো না। আজ তাই বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে তার। অনেক কাজ করার পর হাতে কাজ না থাকলে যে অবসাদ—তা যেন আজ কঠিন নিগড়ে বেঁধে ধরেছে তাকে। প্রতিশোধের জ্বালা অবশ্য মিটেছে, আলীমর্দ্দান এখন নিশ্চয়ই দোজকের কারাগারে রুদ্ধ, আর তার সংগী-সাথীদের আমৃত্যু পচতে হবে অন্ধকার গৃহকোণে। বাইরের কোন কোলাহল আনন্দ সংবাদ সেখানে পৌঁছবে না কোন দিন। তবু আজ এই প্রথম নিজেকে এমন ক্লান্ত, দীন মনে হচ্ছে দেলোয়ারের।

আখতারবানুর কথা মনে পড়ছে। সেই সুন্দর ঢলঢলে মুখে সর্ব্বদা হাসি খেলতো। চোখের কোল জুড়ে চমৎকার একটা ভাঁজ ছিল, হাসলে ভাঁজটা বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ত সারা মুখে। টিকোলো নাকের পাশে যখন ঘাম জমতো, মনে হতো রাশিকৃত চুমকি বিন্দু যেন লেগে রয়েছে। আজো যদি সে বেঁচে থাকে, তাকে দেখলে কি দেলোয়ার এখনো চিনতে পারবে ?

সাধারণ সৈনিক-সর্দ্দারের জীবন ছিল তার, ডিউটী সেরে বাকি সময় কবিতা রচনা আর গান-বাজনা করে দিন কেটে যেত। ঘরে রূপোসী বউ, সে মাঝে মাঝে এসে হাসি চপলতায় প্রাণে আবীর ছড়িয়ে যেত। মধুর দিনযাত্রা। তারপরই কোথা দিয়ে কি ওলোট পালট হয়ে গেল। সন্ধ্যার চিরাগ জ্বেলে প্রাণের আকুতি জানাবার সময় আলীমর্দ্দানের লোকেরা এসে তাকে জোর করে মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে গেল ভোগের উদ্দেশ্যে।

বিচিত্র নবাব! সব শুনলো কিন্তু একটা কঠোর বিধান জারী করলো না, খুঁজে বের করলো না তার প্রাণের বেগমকে। সমস্ত ঘটনাটা শুনলো অনেক পরে। তার পর থেকেই সেই ধিকি ধিকি

আগুন জ্বলছে বুকের ভেতরে। হিন্দুদের শবদাহের সময় চিতা জ্বালানো হয়, লকলকে আগুনের শিষগুলোকে দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন লক্ষ হাতের নেই-নেই ডাক। যেন সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তামাম জগৎটাকে গিলতে চায় মুহূর্ত্তে। সেই আগুনের ডাকানি ও চৌপহর দিন দেলোয়ারের বুকের গভীরে এতাবৎ কাল গুমরেছে, আলীমর্দ্দান নেই, আলীমর্দ্দান থাকবে না। বদলা চাই বদ্‌লা।

আজ সেই বদলা নিরসনেই যেন অবসাদে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে তার মন। এই ফাঁকে মুরশেদের গান বেজেছে অন্তরে, ঘর মনে হচ্ছে বন্ধনের ডোর—ভেঙ্গে ফেলে পথে বেরিয়ে পড়তে পারলেই অনন্ত মুক্তির স্বাদ মিলবে।

সে পথ চলেছে একলা। পিছনে আনন্দ মুখরিত নগরী। নগরীর প্রধান ফটকে শানাইওয়ালা সুর তুলেছে শুদ্ধরাগের, টোরী ধরেছে। ঘোড়সওয়ারের দল চক্কর দিচ্ছে নগরীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। অশ্বখুরের খুপ খুপ শব্দ হচ্ছে চারদিকে। দ্রুত দৌড়নোর জন্য এরই মধ্যে অনেক ঘোড়াকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ছেলেরা ঘুড়ি লাটাই ফেলে অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে মিছিলের দিকে। দেলোয়ার নগরীর প্রধান ফটক পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। অন্তহীন যেন এ পথ। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে আজ আর মনে পড়ছে না। তেলিয়াগড়? বুদায়ুন, দিল্লী, পেশোয়ার, কাবুল, বাগদাদ, মক্কা? অথবা আরো দূরে। কে জানে হয়তো দোজাক পর্যন্তই চলে গেছে, অথবা বেহেস্তেরই রাস্তা এটা।

মেঘভাঙ্গা রোদ উঠেছে। চার দিক ঝলমল করছে রূপালী আলোয়। আশ্বিন মাস, কাশ ফুল ফুটেছে মহাসমারোহে। সুন্দর লাগছে। চারিদিকটা যেন মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে কেউ। ফি জুম্মাবারে চিশ্‌তি সাহেবের দরগায় এইভাবে মোমবাতি দিয়ে সাজানো হতো। বৃষ্টি বন্ধ হবার পর চারি দিকটা এমন সতেজ

দেখায় বলেই এ সময়টা এত পছন্দ তার। খালি মনে গান আসে গান আর শায়ের। কোথায় নীলকণ্ঠ পাখী ডাকছে একটা—

ডাকটা অনেকক্ষণ ধরে কেঁপে কেঁপে বেজেই চলেছে।

দেলোয়ার নদী তীরে এসে দাঁড়াল।

তুটো নদীর সঙ্গম স্থল। বর্ষার পুষ্ট ছন্দে এখনো ভাটির লগি পড়েনি। থৈ-থৈ করছে জলধারা। তীরের প্রায় কানা পর্যন্ত জলস্তর। জল পাক খেয়ে খেয়ে নৃত্য ছন্দে বয়ে চলেছে। দেলোয়ারের আবার আখতারবানুর মুখ মনে পড়ছে। সেই চিকন-চাকন ঢলঢলে মুখ-ছাঁদ। ঘামের টিপ জমতো নাকের তু'কোল দিয়ে। হাসলে চোখ তু'টো বুজে গিয়ে সুন্দর ক'টা ভাঁজ চলকাতো।

—মাঝি, আমাকে নিয়ে যাবে?

—ক'থা যাবেক বাবু।

—তোমার সঙ্গে। অকুল পাথারে ভাসতে চাই আমি।

কি বুঝে মুচকে হাসলো মাঝি। ডাকলে, আইসো।

দেলোয়ার গিয়ে অপর প্রান্তে গলুইয়ের ওপর চেপে বসলো।

—একটা গান গাইবে!

মাঝি আবারো হাসলো। তারপর গান ধরলো উচ্চগ্রামে:

সুজন নাইয়ারে—

ক্যামনে যাবি ভব নদী বাইয়া.........

আকাশ বাতাসে সুরেলা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। মনকে মুহূর্তে আকুল করে তোলে। ভুলিয়ে দেয় সব বন্ধন, মায়া মোহ কামনা-বাসনার সব আকাঙ্ক্ষাগুলি।

নৌকো ভেসে চলে কচি কচি ঢেউয়ের স্তর ভেঙ্গে। এগিয়ে চলে ওরা। চার দিক থেকে আকুলি-বিকুলি খাচ্ছে বাতাস। যত দূর চোখ যায় শুধু যেন আদিগন্ত জল আর জল। দাঁড় বয়ে চলে মাঝি। ছপাৎ ছপাৎ শব্দে কেঁপে ওঠে জলের হৃদয়তল অবধি।

এই মুহূর্তে দেলোয়ারের নিজেকে বড় একা মনে হয়। এইতো জীবন। দু'দিনের মুসাফিরের—এর বেশীতো চাইতে নেই। স্নেহ-মায়া-দয়া, লোভ, লালসাগুলি অসৎ পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার টোপ মাত্র। জীবনভোর ওদের গোলাম হয়ে থাকলে শেষ দরজায় তো পৌছোনো যাবে না!

এই প্রথম সংসারের খোলস খুলে নিজেকে একান্ত আপন করে ভাবলো দেলোয়ার। আজ সে পুর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণ। এই পৃথিবীটাকে অক্লেশে আঙ্গুল দেখিয়ে চলে যাওয়া কি সত্যি কষ্টকর!

দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসে দেলোয়ারের। মনে পড়ে ওর প্রিয় শায়েরটা, আওড়াতে থাকে গুন গুন করে।

·········আয়া থা লিয়ে ক্যায়া খোয়ায়িঁ মে ইহাঁ

যাতা হুঁ পশারে হুয়ে ইয়ে দস্ত আজ ম্যয়॥

নৌকো ভেসে চলে মাঝ দরিয়ায়॥